বার্ষিকী
সাসপেন্স
রহস্য-রোমাঞ্চ সংকলন
বর্ষ ৪ ● সংখ্যা ৪ ● ২০২৪

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে

একটি দাবি সনদ

রহস্য, রহস্য, সবটাই এখনও রহস্যে মোড়া। দুঁদে গোয়েন্দারা পর্যন্ত কুয়াশা সরিয়ে আলোর সন্ধান পাচ্ছেন না। তবুও আশা করা যাক, যতদিনে এই বার্ষিকী আলোর মুখ দেখবে ততদিনে আলোর দিশা দেখবে এই ভয়ংকর খুনের ঘটনাটিও। তদন্তকারীদের উপরও যে এখন পাহাড়প্রমাণ চাপ। এমন ঘটনা তো সচরাচর ঘটে না, যা কিনা সারা পৃথিবীর নজর কেড়ে নেয়, প্রতিবাদী করে তোলে বিশ্বের প্রত্যন্ত প্রান্তের কণ্ঠগুলিকেও।

আসলে এই বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলনের ন্যায়সঙ্গত কারণও আছে। রহস্য তো আসলে এক্ষেত্রে একটি নয়, একাধিক। আর এত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশও ঠিক সেই কারণেই। রহস্য যদি শুধু খুন বা ধর্ষণকে ঘিরে হত, তাহলে সময় লাগলেও আশা করা যেতে পারত গোয়েন্দারা আসল অপরাধীকে ঠিক খুঁজে বের করে ফেলতেনই। কিন্তু সমস্যা যে অন্য জায়গায়। ঘটনাপ্রবাহ যে ইঙ্গিত দিচ্ছে, এক্ষেত্রে আসল অপরাধীকে হয়তো বা আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় রহস্য এই জায়গাতে, কেন করা হচ্ছে এমনটি? পোস্টমর্টেম এবং ফরেনসিক রিপোর্ট থেকে যা জানা যাচ্ছে তা বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপরাধী এক্ষেত্রে কোনোভাবেই একজন হতে পারে না। যদি ধরে নেওয়া যায় এই বিশ্লেষণ সঠিক, তাহলে সিবিআই পর্যন্ত কেন-ই বা তার প্রাথমিক রিপোর্টে সুপ্রিম কোর্টকে জানাচ্ছে, অপরাধী একজনই?

তাই মনে হচ্ছে, রহস্য রহস্য। খুন, ধর্ষণের পাশাপাশি রহস্য বোধহয় ষড়যন্ত্রেরও। প্রথম রহস্যের পিছনে যে গভীরতর কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে তা তো সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ থেকেও পরিষ্কার উঠে আসছে। অপরাধ আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রায় চোদ্দো ঘণ্টা পরে কেন এফআইআর করা হল? উত্তরে বলা হতে পারে, মৃত্যুটিকে অস্বাভাবিক তা বুঝতেই সময় লেগে গেছে। যদি উত্তর এটাই হয় তাহলে তো দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে, যদি অস্বাভাবিক মৃত্যুই সন্দেহ না করা হয়, তাহলে পোস্টমর্টেম করা হল কেন?

তাই রহস্য একটি মাত্র নয়, রহস্য অনেক, প্রশ্ন আরও অনেক। আমরা আমাদের উৎসব সময়ের সামনে চলে এসেছি। এই বার্ষিকীর প্রকাশও সেই উৎসব উপলক্ষেই। কিন্তু এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্যের উর্ণনাভ, ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে ফেলছে উৎসবের মেজাজকেও। এই উৎসব একটি বাৎসরিক ঘটনা। অতীতে হয়েছে, আগামী দিনেও আসবে। উৎসবকে গৌণ করে এখন বর্তমানের দাবি কেবল রহস্যের যথাযথ উন্মোচন। একটি রহস্য বার্ষিকীর কাছ থেকে এই দাবি তো আরও বেশি কাঙ্ক্ষিত। আমরাও তাই দৃঢ় গলায় দাবি করতে চাই, উৎসবের আনন্দ আপাতত স্থগিত থাক, আগে বিচার হোক। এই বিচার সংঘটিত অপরাধীদের জন্য যত না প্রয়োজনীয়, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় আগামী দিনের সকালগুলিকে সুন্দর করে তোলার জন্য।

সেপ্টেম্বর ২, ২০২৪
আরামবাগ, হুগলি

অনিন্দ্য ভুক্ত

সম্পাদক
অনিন্দ্য ভুক্ত
প্রচ্ছদ
সৌজন্য চক্রবর্তী
অলংকরণ শিল্পী
ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য, মৃণাল শীল, প্রণব হাজরা, আশিস ভট্টাচার্য, সোমনাথ পাল, সুদীপ্ত মণ্ডল, সঞ্জয় দাস
বানান সংশোধন
নিবেদিতা মজুমদার, অনন্যা দে, সৌরভ পাল, সমন্বিতা ঘোষ, আশিস সামন্ত, রিয়া মিত্র
বিন্যাস **অরূপ ঘটক**
সম্পাদকীয় ব্যবস্থাপনা **অপূর্বকুমার পাল**
সম্পাদকীয় বিভাগ **শর্মিষ্ঠা নাথ, অভিষ্যন্দা লাহিড়ী দেব**
জনসংযোগ **নিবেদিতা মজুমদার**
বিপণন **নীলাভ বিশ্বাস**
প্রচার-নিয়ন্ত্রণ **অলোক ব্যানার্জি**

— **প্রাপ্তিস্থান** —
ম্যাগাজিন ডিস্ট্রিবিউটর
রবি সাহা (ডেকার্স লেন), পাতিরাম (কলেজ স্ট্রিট), শ্যামল বুক স্টল (টেমার লেন), মদন তরফদার (শিয়ালদহ)
বুকস ডিস্ট্রিবিউটর (কলেজ স্ট্রিট)
এলএফ বুকস আউটলেট (সাহা বুক স্টল), দে বুক স্টোর (দীপুদা), দে'জ (চিরঞ্জিত), জানকী বুক ডিপো, বুক ফ্রেন্ড, দাস বুক স্টল, প্রণব বুক স্টল, ব্লিজ, অরণ্যমন, প্ল্যাটফর্ম, শব্দ প্রকাশন, অভিযান বুক ক্যাফে, বইবন্ধু পাবলিশার্স
অনলাইন বুক সেলার
রিড বেঙ্গলি বুকস, স্মেল অব বুকস, বুক-লুক, ওপারের বই, দূরের বই, ভেস্ট পকেট, কলকাতা বুক সেলফ, গল্পগুচ্ছ অন্যত্র
বাংলাদেশ
বাতিঘর, রকমারি ডটকম, ইন্দো-বাংলা বুক শপ, তক্ষশীলা, অক্ষর, এক্স ওয়াই জেড, সাজাহান বুকস, প্রথমা, বুক চয়েস, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র অন্যত্র

—**মুদ্রক**—
প্রিন্ট-ও-প্রসেস
১৫/৫, কে বি সরণী, মল রোড, দমদম, কলকাতা-৮০
—**বাঁধাই**—
এমএ বাইন্ডিং ওয়ার্কস
—**প্রকাশক**—
লিইবার ফিয়েরা
এলএফ বুকস ইন্ডিয়া, দেবনাথ হাউস, কবি সুকান্ত রোড, নবপল্লী, বারাসত, কলকাতা-১২৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

₹ ৪৯৯/-

ISBN: 978-93-93629-87-6
https://lfbooksindia.com
Customer Support: **9073872878**

সূ চি প ত্র

সাসপেন্স বার্ষিকী ● বর্ষ ৪ ● সংখ্যা ৪ ● ২০২৪

ক্রোড়পত্র: অলিম্পিক ও অপরাধ

মিউনিখ হত্যাকাণ্ড
সৌরাংশু ৩৪

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২; মিউনিখের অলিম্পিক ভিলেজের ঘড়িতে তখন ভোর চারটে বাজে। আধো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ভিলেজের ২৫-এ নম্বর গেট টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ল ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সদস্য ইসা এবং অন্যরা! তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন বিভিন্ন কোচ ও খেলোয়াড়রা। ওঁদের মধ্যে দুজনকে হত্যা ও নয় জনকে বন্দি করে ইসা ও অন্যান্যরা। অনেকে আহতও হন আচমকা লড়াইয়ে।

হিটলার প্রপাগান্ডা ও জেসি ওয়েন্স
অর্পণ গুপ্ত ৩৯

জীবনে সবক্ষেত্রেই যে বিষয়টি খুব জরুরি, সাম্যবাদ। অলিম্পিকও সাম্যবাদের এই বিশেষ নীতিতে চলে। এখানে ছোটো-বড়ো নেই, সকলেই সমান। কিন্তু ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিককে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ভেদাভেদের মঞ্চ করে তুলেছিলেন অ্যাডলফ হিটলার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভাজনকে সরিয়ে চার-চারটে পদক জিতে নেন এক কৃষ্ণাঙ্গ; যার নাম জেসি ওয়েন্স।

হাঙ্গেরি-সোভিয়েত দ্বৈরথ
ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় ৪৩

১৯৫৬-র মেলবোর্ন অলিম্পিকের ময়দানে যখন হাঙ্গেরির দল স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে পৌঁছেছিল তখন তাদের সব কিছু চলে গিয়েছে রুশদের দখলে। বহু পরিবার উদবাস্তু, বহু মৃতদেহে শহর ছেয়ে গিয়েছে। কিন্তু জলের নীচের লড়াইয়ে পিছিয়ে থাকেনি হাঙ্গেরির ওয়াটারপোলো দলের খেলোয়াড়রা। সমস্ত অপমানের যোগ্য জবাব দিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল। যদিও বহু খেলোয়াড়ের কাছে এটাই ছিল জীবনের শেষ খেলা।

অপরাধ ও বিতর্কের অলিম্পিক
সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় ৪৮

সমস্যা ব্যতীত জীবন হয় না। আর অলিম্পিকের মতো খেলাতে বিতর্ক সর্বক্ষণের সঙ্গী। কখনও বা তাতে কৃষ্ণাঙ্গ বলে কাউকে অপমান করা হয়, কখনও বা তাতে বিভিন্ন বাহানা তুলে কাউকে প্রতিযোগিতা থেকে বাইরে রাখা হয়, আবার কখনও কোনও দেশ গেমস বয়কট করে। কেউ বা অন্যায়ভাবে ডোপিং করে। সব কিছু আমাদের সামনেও আসে না। ১৯০৮-২০২৪ অবধি অলিম্পিকের বিভিন্ন সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে এই লেখাতে।

রাশিয়ান ডোপিং স্ক্যান্ডাল
সৌভাগ্য চট্টোপাধ্যায় ৫৫

অলিম্পিকের মতো খেলাতে নিজেদেরকে প্রমাণ করা খুব সোজা নয়। এই গেম শো-তে নিজেদের নাম এবং জায়গাকে সুনিশ্চিত করতে ডোপিং শুরু করে রাশিয়া। এতে করে তাদের খেলোয়াড়রা অন্যায়ভাবে অধিক শক্তির অধিকারী হতে পারত। আর এই পুরো প্রক্রিয়াতে তাদের সহায়ক ছিলেন রোডচেনকোভ। ক্রীড়াজগতে এই ভুল পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য রাশিয়াকে ব্যান করা হয় বহুবার। রাশিয়া আজও চেষ্টা করছে মূল স্রোতে ফেরবার।

অলিম্পিক ও অপরাধ

আটলান্টা অলিম্পিকে বোমা হামলা

শমীক বাইন ৫৯

১৯৯৬ সাল ছিল অলিম্পকের একশো বছর পূর্তির উৎসব। স্বামী ও চোদ্দো বর্ষীয়া কন্যাকে নিয়ে চুয়াল্লিশ বর্ষীয়া এলিস হাথর্ন সেন্টিনিয়াল অলিম্পিক পার্কে অলিম্পিক গেমস পরবর্তী একটি রক কনসার্ট উপভোগ করতে পৌঁছেছিলেন। মধ্যরাতের কিছু পরেই তিনটি পাইপ বোমা একসঙ্গে বিস্ফোরণ হল অলিম্পিক পার্কে। এলিস হাথর্ন বিস্ফোরণের ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান, তাঁর নাবালিকা মেয়েও সাংঘাতিকভাবে জখম হন।

বিশেষ নিবন্ধ

গঙ্গার পথ ধরে

চঞ্চলকুমার ঘোষ ৮

ভারত হল নদীমাতৃক দেশ। আর গঙ্গার জল ছাড়া আমাদের কোনও শুভ কাজ হয় না। আমাদের দেশে গঙ্গার পাড়েই গড়ে উঠেছে পীঠস্থান। আবার এর পাড়েই রয়েছে শ্মশান। গঙ্গাকে ঘিরে কাহিনির কোনও শেষ নেই। সেই গঙ্গার পথ ধরে তীর্থরাজ প্রয়াগের দিকে যেতে যেতে কী অনুভূতি হল লেখকের, তারই অদ্ভুত সুন্দর কথন এই লেখনীটি।

উপন্যাস-নভেলা

মহাসর্পের গুপ্তধন

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য ৯৬

পূর্ণিমার রাত নিয়ে সাধারণ মানুষের মনেই কল্পনার কোনও শেষ নেই; আর কবি সাহিত্যিকদের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হল। আর হবে না-ই বা কেন? সেই রাতের মাধুর্য কম তো নয়। কিন্তু সেই রাতেই 'তারা' বের হয়; খাজনা আদায়ে। একজন কালো, আর একজন গৌরবর্ণের। কিন্তু কারা এরা? কেন পূর্ণিমার রাতেই এরা অভিশাপ হয়ে যায় সকলের জীবনে?

বাতাসে রক্তের গন্ধ

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত ৪০৮

পর্যটন কেন্দ্র করার আশাতে সরকারের থেকে একটা দ্বীপ লিজ নেওয়ার কথা ছিল বিদ্যুৎদের কোম্পানির। সেই কারণেই গিলিগিলি দ্বীপটা পরীক্ষা করতে যায় বিদ্যুৎ। কিন্তু সেই দ্বীপে গেলে মানুষ আর ফেরে না। কী হবে এবারে? বিদ্যুৎ কি পারবেন ফিরতে?

চিকিজিমা রহস্য

রাজা ভট্টাচার্য ১৩০

কলকাতার রাস্তা থেকে হঠাৎ করেই গায়েব হতে থাকে পথবাসী কিছু মানুষ। পথবাসী বলে প্রথমে কেউ খেয়াল করেনি। ধীরে ধীরে নজরে আসে বিষয়টা। প্রথম তিনজনের মৃতদেহও পাওয়া যায় না। চতুর্থ জনের মৃতদেহ দেখে পুলিশ মহল অবধি ঘাবড়ে যায়। তদন্ত করতে নামে পুলিশের বড়ো বড়ো অধিকর্তারা। কোথায় যাচ্ছে এই সব হোমলেস মানুষেরা?

রিল রহস্য

পার্থ দে ৩৩৬

সংগ্রহ একটি নেশা। বর্তমানের সংগ্রহই ভবিষ্যতের কাছে ইতিহাস হয়ে ধরা দিতে পারে। অনেকরকম সংগ্রহের নেশা থাকে মানুষের। এইরকমই একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র গবেষক, সমালোচক সত্রাজিৎ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে চুরি যায় তাঁর সংগ্রহে থাকাএকটা সিনেমার রিল। চুরি যাওয়া রিলটা ছিল 'কুঠিবাড়ির অশরীরী' বলে একটা বাংলা সিনেমার। কে চুরি করল রিলটা? কীভাবেই বা চুরি গেল? কেসটা তদন্ত করতে নামল ব্রহ্মজিৎ আর অন্তরীপ...

উপন্যাস-নভেলা

সিদ্দিক সাহেবের ডায়েরি

অনিরুদ্ধ সাউ ১৪৬

অদ্ভুত এই মানবমন। আসলে মানব মনের মতো জটিল কিছু নেই। সেই জটিল বিষয়েই চর্চা করতেন সিদ্দিক সাহেব। কিন্তু সেই চর্চা অসম্পূর্ণ রেখে হঠাৎ একদিন তাঁর মৃত্যু হল। কিন্তু মৃত্যু কি আদৌ হল? না কেউ তার হত্যা করল? তার মৃত্যুর পরে কি পাওয়া যাবে তার ডায়েরিটা? যদি পাওয়াও যায়, তবে কোন তথ্য উঠবে সেখান থেকে?

রাফ কাগজ

শরণ্যা মুখোপাধ্যায় ১৯২

শক্তি। বড়ো কঠিন জিনিস। কম থাকলে জীবনে চলা মুশকিল। আবার বেশি থাকলে অপচয় হতে পারে। না থাকলে জীবন থাকে না। আবার সমতায় থাকলে সঠিক ব্যবহার হয়। শক্তিহীন মানুষের জীবন একটা অভিশাপের মতো। কিন্তু এই শক্তি দিয়ে কি স্মৃতিকে নষ্ট করা যায়? ইতিহাসকে কি বদলানো যায়? যদি যায় তাহলে ঠিক কী হবে? দেখা যাক...

কিডন্যাপার

মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ ২৩০

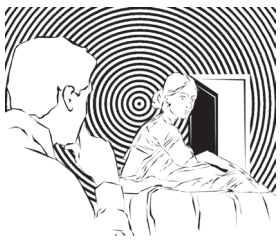

পুচুনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। পুচুন আর কেউ নয়, ক্লাস ইলেভেনে পড়া সাধারণ একটা ছেলে। বাড়িতে দু'লাখ টাকা চেয়ে ফোনও আসছে। কিন্তু কে কিডন্যাপ করতে পারে একটা ছোটো ছেলেকে? তবে এ কোনও পারিবারিক বিবাদের জের? আত্মীয়-স্বজনরা অস্থির তার চিন্তাতে। পুচুনের বাবা পুলিশের দ্বারস্থ হলেন। জোগাড় করলেন টাকারও। শেষ পর্যন্ত কি সমস্যার সমাধান করলেন পুলিশেরা?

আড়ালে কে!

দৃপ্ত বর্মন রায় ২৭৪

নামকরা প্রোডিউসার অচিন্ত্য সরকার খুন হলেন নিজের বাড়িতে। কিন্তু খুনের অভিযোগে আটক করা হল তারই একমাত্র ছেলেকে। কিন্তু কেন? হাল খুঁজে না পেয়ে লালবাজারের ইনস্পেকটর গৌতম দ্বারস্থ হল রিটায়ার্ড সিবিআই অনিকেতের কাছে। কিন্তু অনিকেত কি পারবেন আড়ালে থাকা হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে!

একটি শূকরের মৃত্যু অথবা...

মার্জারি অ্যালিংহ্যাম

অনুবাদ: অভিষ্যন্দা লাহিড়ী দেব ৩৫৪

শখের গোয়েন্দা অ্যালবার্ট ক্যাম্পিয়নের এক স্কুল জীবনের সহপাঠী দু'বার মারা গিয়েছে! ক্যাম্পিয়ন স্কুল জীবনে যে সহপাঠীকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করতেন, সেই পিগ পিটারস মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে দু'বার মারা গিয়েছে। পিগের কি কোনও ভাই ছিল, যাকে প্রায় একইরকম দেখতে, নাকি যে দ্বিতীয়বার মারা গেল সে অন্য কেউ? দ্বিতীয় ঘটনার পরে তার শবটা জলে ডোবানো হল কেন? ক্যাম্পিয়নকে কবিতায় লেখা বেনামী চিঠিগুলোই বা কে লিখেছে? মার্জারি অ্যালিংহামের লেখা এই উপন্যাস বিশ্বের রহস্য উপন্যাসের অন্যতম সেরা সম্পদ।

একটি স্বপ্নে পাওয়া সমাধান

জি কে চেস্টারটন

অনুবাদ: সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৬

মূল গল্পের নাম 'দ্য পয়েন্ট অফ আ পিন'। এই গল্পটি নেওয়া হয়েছে 'দ্য স্ক্যান্ডাল অফ ফাদার ব্রাউন' বই থেকে। স্বয়ং ফাদারের মতে এই সমাধান উনি স্বপ্নে পেয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির উলটোদিকের একটি নবনির্মিত ফ্ল্যাটের মধ্যে ঘটে যাওয়া খুনের ঘটনার সমাধানের মধ্যে ফুটে উঠেছে ফাদারের চিন্তার স্বচ্ছতা আর বিশ্লেষণের মুনশিয়ানা। আর কিছু নয়, বিল্ডিং ফার্মের মাথা হারবার্ট স্যান্ডসকে কেউ কেন খুন করতে চাইবে তাই নিয়েই গল্প। জে কে চেস্টারটনের কলমে এই কাহিনির সাহিত্য মূল্য নিয়ে প্রশ্নই উঠতে পারে না।

উপন্যাস-নভেলা

বিষের ছোবল

অনিন্দ্য ভুক্ত ৩০২

বন্ধু, বন্ধুত্ব; এসবের একটা আলাদাই মজা আছে। বন্ধুহীন জীবন অনেকটা বোঝার মতো। এরকমই দুই বন্ধুকে আমরা পাবো। একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদারে এক হয় এদের দুই পরিবার। এই দুই পরিবারের বন্ধুত্ব প্রজন্মগত চলছে। এরা মাঝে মাঝেই একসঙ্গে মিট করে। কিন্তু হঠাৎ কী হল? এক সদস্য দুপুরে খেতে বসে পাতের উপর পড়েই মারা গেল! কেন? তবে কি এটা খুন? নাকি অন্য কিছু?

লেখার আমন্ত্রণ ২০২৫

'সাসপেন্স বার্ষিকী ৫' বর্ষসংখ্যায় লেখা পাঠাতে গেলে https://lfbooksindia.com ওয়েবসাইটে গিয়ে পাবলিশ উইথ আস এবং অ্যানাউন্সমেন্ট সেকশন দেখুন ভাল করে। লেখা ইউনিকোড বাংলায় ওয়ার্ড ফাইল এবং পিডিএফ—দুই ফরম্যাটেই ই-মেল (lfbookseditorial@gmail.com) মারফত পাঠাতে হবে। এই বার্ষিকীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একমাত্র বিচার্য লেখার গুণমান। কমপক্ষে ৩০০০ শব্দ সংখ্যা থেকে ২৫০০০ শব্দ সংখ্যার কমবেশি গল্প, অনুবাদ, বড়গল্প, উপন্যাস, উপন্যাসিকা পাঠানো যাবে। লেখাটি অবশ্যই সম্পূর্ণ মৌলিক, অপ্রকাশিত (যেকোনও মাধ্যমে) এবং পূর্ববর্তী কোনও লেখার পরিমার্জিত হলেও চলবে না। সাধারণত লেখা পাঠানোর ক্রমানুসারে মনোনীত (কমপক্ষে ছ'মাস) লেখা বার্ষিকীতে রাখা হবে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫।

—(ISP) এলএফ বুকস

বড়োগল্প

নির্বাণ তিমির

সুপ্রিয় চৌধুরী ৮৭

সময় বড়ো রহস্যময়। কাকে কোন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেবে, কেউ তা জানে না। কোন সম্পর্ককে গঠন করবে, আর কাদেরই পৃথক করবে; এ তো কেবল সময়ের হাতে। তেমনই এক সময়ের আলেখ্য হল এই গল্প। তমালের জীবনের এই ওঠাপড়া আসলে অমাদের সকলেরই জীবনের ছবি।

খোলস

কমলেশ কুমার ৭৯

কাকু শর্মা। এক অদ্ভুত চরিত্র। একদিকে মার্ডার, নারী পাচারের মতো জঘন্য কাজ করে। আবার অন্যদিকে রামকৃষ্ণ কথামৃতও পড়ে। বর্তমানে সে সাপের বিষ পাচারের কাজ করছে। তার হয়ে তাকে সহায়তা করে রুস্তম। একদিন হল কী, রুস্তম সাপের বিষ নিতে গিয়ে দেখল জাভেদ খুন হয়েছে। এই জাভেদের থেকেই রাতের অন্ধকারে সাপের বিষ কেনার কথা ছিল রুস্তমের। কিন্তু কে খুন করল জাভেদকে?

পাথরে পায়ের ছাপ

জয়দীপ চক্রবর্তী ৬৯

প্রভু যীশুর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তিনি নাকি মারা যাননি। এসেছিলেন ভারতে। আর সেই ভারতেই নাকি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে। বৌদ্ধ পণ্ডিতদের লেখা 'সন্ত ইশার জীবনকাহিনি'তেও নাকি এইসব কথা রয়েছে। তো সেই মহামানবের পায়ের ছাপ নাকি পাওয়া গিয়েছে কাশ্মীরে। এখন এটা সত্যি নাকি গুজব; তার খোঁজেই কাশ্মীরে চলল পরিদাদু ও তার টিম।

অসকাল

সুস্মিতা নাথ ২৫৭

রামলাল চোপরা যাচ্ছিল কোম্পানির জন্য ডিল করতে। হঠাৎ ধীরজ কুমারকে দেখতে পেল, যে কিনা একভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আগেও দু'বার সে ধীরজ কুমারকে দেখেছে; একবার হাসপাতালে, আরেকবার রাস্তাতে। এই ধীরজ কুমার একসময় তো কাজ করত রামলালের কোম্পানিতে। তবে কেন ধীরজ কুমারকে দেখে আঁতকে উঠছে রামলাল?

বড়োগল্প

গোপন কথাটি

শুভায়ন বসু ২৬৫

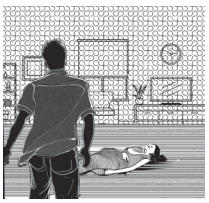

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় সুজিত সামন্তের বন্ধু অর্ণব চ্যাটার্জিকে। ডাকা হল গোয়েন্দা সৌরনীলকে। তদন্তে নেমে সৌরনীল বুঝতে পারে পারলেন তথ্যে অনেক গোলমাল আছে। এক পুলিশ পুরো বিষয়টা দেখেনি। আর বাকিরাও সত্যি কথা বলছে না। কী হবে শেষ পর্যন্ত সেটাই দেখার এখন। সৌরনীল কি পারবেন, এই খুনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গোপন সত্যিকে খুঁজে বের করতে?

শেষ দিগন্তে গুণময় রায়

রঞ্জন দাশগুপ্ত ৩২১

কিছু জিনিস নিয়ে আমাদের নানা রকমের বিশ্বাস আছে। সেগুলো ভুল না ঠিক আমরা জানি না। যেমন হাঁচি, টিকটিকি, আনলাকি থার্টিন, অশুভ সংখ্যা তিন ইত্যাদি। কমবেশি আমরা সবাই এক শালিক দেখে দ্বিতীয়টার খোঁজ করেছি। বা বিড়াল রাস্তা কাটলে মাঝ রাস্তাতে দাঁড়িয়ে পড়েছি। তা ঘটনাচক্রে একেবারে ছোটোবেলাতে গুণময় রায় একবার এই 'তিন' সংখ্যার কবলে পড়েছিলেন। তারপর সব ঠিক হল? নাকি সেই 'তিন' অশুভ হয়ে গেল? দেখাই যাক...

ছোটোগল্প

পুরস্কারের আড়ালে

শেখর বসু ৩১৬

কৌশিক, একজন গোয়েন্দা। শিল্পপতি রতনকে সে খুব ভালোবাসে। দাদার মতো ভক্তি করে। তো একদিন এই রতনদার থেকেই কৌশিক জানতে পারল পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারটা। সরকার থেকে নাকি সমাজসেবকদের পুরস্কার দেওয়া হবে। রতনদাও সমাজসেবক। তাই তিনিও এর অধিকারী। কৌশিক তো মহা খুশি। কিন্তু অনুষ্ঠানে যেতে চাইছিলেন না রতনদা। কেন এই দ্বিধা? শেষ পর্যন্ত রতনদা কি পুরস্কার পেলেন? নাকি পুরস্কারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অন্য কোনও সত্যি?

এক রাজনৈতিক খুনের তদন্ত

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪

ভোটের কিছুদিন আগে বীরভূমের গো-হাট কেন্দ্রের প্রার্থী অরূপ কুমার খুন হয়ে যায়। পুলিশ এই জরুরি অবস্থাতে খবর দেয় গোয়েন্দা মেঘনাদকে। তদন্তে নামে মেঘনাদ। আর আচমকাই আরেক প্রার্থী খুন হয়। সে হল অরূপ কুমারের বিরোধী পক্ষ সরল মাহাতো। কিন্তু কেন ভোটের আগে এই খুনগুলো হচ্ছে? মেঘনাদ কি পারবেন এই রাজনৈতিক খুনের আড়ালে থাকা মাথাকে খুঁজে বের করতে?

ওরা আটজন ছিল

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী ১১৯

পরপর সাত মাস ধরে মাসের ঠিক তেরো তারিখে রাত ঠিক এগারোটাতে উত্তর কলকাতার এক বিশেষ জায়গাতে একটা করে খুন হতে থাকে। প্রতিবারেই খুনের ধরন এক। তবে কি এটা সিরিয়াল কিলিং? নাকি অন্য কিছু? প্রতিবারেই পুলিশ ব্যর্থ হচ্ছে। আবার প্রতি সময়েই এমন একটা বাড়ির সামনে খুন হচ্ছে, যার নম্বর কোনও এক মৌলিক সংখ্যা। কীভাবে সমাধান হবে এর রহস্য?

বিশ্বাসঘাতিনী

বিপুল মজুমদার ১২৫

চন্দন, এক পেশাদার বাইক চোর। অনবদ্য কায়দাতে বাইক চুরি করাই তার পেশা। পুলিশও তাকে ধরতে পারে না। সেই পেশাদার চোর চন্দন পড়ল এক নারীর প্রেমে। এখন সবাই জানে এই প্রেম জিনিসটা বড়োই গোলমেলে। চোখ থাকতেও মানুষকে অন্ধ করে দেয়। আচ্ছা, চন্দনের ঠিক কী হল? তার এই সাধের প্রেম কি পূর্ণতা পেল? নাকি এই প্রেম তার জীবনকে নিয়ে গেল অন্য কোনও দিকে?

ছোটোগল্প

লালবাজারের লালবাড়িতে

নজরুল ইসলাম ১৮২

লালবাজারের লালবাড়িতে গোয়েন্দা প্রধান হয়ে এসেছে মণি। হঠাৎ একদিন কমিশনার সাহেব মণিকে ডেকে পাঠালেন। কমিশনারের ঘরে ঢুকতে গিয়ে মণি দেখতে পেল যে, সিআইডির এসএসপি মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বসে রয়েছেন; বিশেষ কোনও কেসে সাহায্য পাওয়ার আশাতে। মণি কি পারবেন সিআইডিকে সাহায্য করতে?

বাড়ির পিছনের গলি

সাগরিকা রায় ২১১

আজকাল যাদবের বারেবারেই মনে হয়, বাড়ির পিছনের গলি থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। এদিকে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হওয়াতে যাদবের মা নিখোঁজ হয়। সব জায়গাতে মাকে খুঁজছে যাদব। যাদব কি সত্যিই পারবে, তার মাকে খুঁজে বের করতে? আর তার বাড়ির পিছন থেকে কে তাকে বারেবারে ডাকছে? কোনও সংযোগ আছে কি এই দুটো ঘটনার মধ্যে?

পাইনভিল ম্যানশন রহস্য

অনন্যা দাশ ২১৭

খুন হলেন মধুময় সেন ও তার প্রাইভেট ডাক্তার। গ্রেফতার করা হল মধুময় সেনের মেয়ে অনিতাকে। পুলিশ তাকে গ্রেফতারও করে। কিন্তু সে কি সত্যিই এই দুটো খুনের জন্য দায়ী ছিল? নাকি এই খুনের পিছনে লুকিয়ে আছে মধুময় সেনেরই কোনও অতীত?

ক্রশকানেকশন

শাশ্বত সরকার ২২৪

সময়। সময় হল সবথেকে অদ্ভুত জিনিস। একে ধরাছোঁয়া যায় না। কিন্তু এর প্রভাবে কত কিছু ঘটে। সময়ের প্রভাবে পুরোনো স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। জীবন নতুন ভাবে এগিয়ে চলে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের চিন্তা নিয়েই সকলের জীবন চলে। আজ যা বর্তমান, কালকে সেটাই অতীত হবে। আবার আজকের বর্তমানই আগামীকালকে গঠন করবে। কিন্তু হঠাৎই যদি অতীত আর বর্তমানের মধ্যে কোনও ক্রশকানেকশন হয়ে যায়, তবে কেমন হবে আগামী?

কবর

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ২৫০

করোনার কথা আমরা সবাই জানি। এক অতিমারী কেড়ে নিয়েছে অসংখ্য প্রাণ। বদলে দিয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থা। বিপর্যস্ত করে তুলেছে মানুষের জীবনকে। এই অতিমারীর প্রভাব কাটতে না কাটতেই বিশ্ব পড়ল আবার এক কঠিন জ্বরের মুখে। আবারও পরিণাম মত্যু। কী-ই বা তার কারণ। বড়ো বড়ো চিকিৎসকরা একজোট হলেন। দেখা যাক আবার কী হয়...

চোর পুলিশের খেলা

পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৩

কোনও এক গ্রাম ছিল, নাম ছুঁচোগ্রাম। ছুঁচোগ্রামে হঠাৎ শুরু হল চুরি। আবার মুশকিল হল, এই চোর ধরবার কাজে একসঙ্গে হাত লাগাল চোর আর পুলিশ। চোর পুলিশের এমন যুগলবন্দি আগে কখনও কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ। যাইহোক কার হাতে ধরা পড়বে চোর? চোরের হাতেই চোর ধরা পড়বে? নাকি পুলিশের হাতে আসবে চোর? চোর-পুলিশের এই খেলাতে দেখাই যাক না কী হয়।

গোখরোর বিষ

প্রসেনজিৎ মজুমদার ৩৩০

সোদপুরের রমেন ত্রিপাঠী একদিন গোয়েন্দা পরিতোষকে ফোন করে তার বাড়িতে ডাকল। বাড়িতে গিয়ে পরিতোষ দেখল যে, রমেন ত্রিপাঠীর জেঠু মারা গিয়েছেন। ফরেনসিক রিপোর্টে জানা গেল, সাপের বিষে এই মৃত্যু ঘটেছে। অথচ শরীরে কোনও আঘাত বা সাপে কাটার দাগ নেই। আশ্চর্য ব্যাপার! কীভাবে বিষ গেল তার শরীরে? গোয়েন্দা পরিতোষ কি সফল হবেন এই খোঁজে?

ম্যামসেল ফ্রেডরিকা

সেলমা অত্তাভিয়া লাভিসা লাগেরলফ

অনুবাদ: অসীম কর্মকার ১৮৭

জন্মের সময় শিশু কাঁদে, আর তাকে দেখে বাকিরা হাসে। মৃত্যুর সময় হওয়া দরকার এর ঠিক বিপরীত। জীবনের কর্ম এমন হতে হবে, যাতে যাওয়ার দিন সবাই কাঁদবে। আর যাত্রী কেবল হাসবে। কিন্তু জীবনের কর্মই তো ঠিক করবে, যাওয়ার দিন ঠিক কী হবে? ম্যামসেল ফ্রেডারিকাও কর্ম দিয়ে বহু মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। জীবনের সব কাজ শেষ হলেও, আরেকটা বছর তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন।

গঙ্গার পথ ধরে

চঞ্চলকুমার ঘোষ

আগের দুই পর্বে 'সাসপেন্স বার্ষিকী ৩' এবং 'শিহরন ২' বর্ষ সংখ্যায় লিখেছি গোমুখ থেকে হরিদ্বার হয়ে সমভূমে গঙ্গার পথ ধরে এগিয়ে চলা। সেই পথে ছিল কানপুর, বিঠুর, কনৌজ। চলতে চলতে এসেছিলাম সিংহেরপুর। সেখানে গঙ্গার তীরে শান্তি দেবীর মন্দির দর্শন করে এবার যাত্রা তীর্থরাজ প্রয়াগের দিকে।

তীর্থ প্রয়াগ

বাস থেকে নেমে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মুঠিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন যাব..."

আর কিছু বলার আগেই লোকটি আঙুল তুলে বলল, "সামনে অটো দাঁড়িয়ে আছে। চলে যান।"

একটু এগিয়ে দেখি রাস্তার ধারে খান চারেক অটো দাঁড়িয়ে। ব্যাগ পত্তর নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অটোওয়ালা এক পলক আপাদ মস্তক আমাকে দেখে নিয়ে বলল, "কোথায়?"

বললাম, "মুঠিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন।"

"একশো টাকা।"

বাসে একজন বলেছিল, "বাস থেকে নেমে রামকৃষ্ণ মিশন দশ মিনিটের রাস্তা।" এইটুকু রাস্তা এত ভাড়া! বললাম, "কত দূর?"

অটোওয়ালা নির্বিকার ভাবে বলল, "একশো টাকা ভাড়া। গেলে বসুন।"

বুঝলাম কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। উঠে বসলাম। দুটো বাঁক পেরিয়ে যেতেই চোখে পড়ল রামকৃষ্ণ মিশনের সুদৃশ্য তোরণ, পিছনে মন্দির। এইটুকু রাস্তা। একশো টাকা ভাড়া। বড়ো অস্বস্তি লাগছিল। মনে পড়ে গেল কানপুরের সেই পুলিশ ভদ্রলোকের কথা। সব জায়গায় কি আর তেমন মানুষ পাব। সে আশাও করি না। তবে গঙ্গার দীর্ঘ পথে চলতে চলতে একটা সত্য উপলব্ধি করেছি অটোওলাদের চরিত্র মোটামুটি সব জায়গায় এক। রামকৃষ্ণ মিশনে আগে থেকে সব ব্যবস্থা করা ছিল, তাই কোনও অসুবিধা হল না। বিকেল হয়ে এসেছিল। নতুন জায়গায় রাতে ঘোরাঘুরি বরাবরই এড়িয়ে চলি। মন্দিরে প্রণাম করে বার হতেই পরিচিত একজন মহারাজ বললেন, "যমুনা নদী ঘুরে আসতে পারেন। পায়ে হাঁটা রাস্তা। সন্ধের আগেই ফিরে আসবেন।"

মিশনের সামনে দিয়ে রাস্তা গিয়েছে। রাস্তায় মানুষের ভিড়, গাড়ি ঘোড়া। বাজার বসেছে। ফুটপাথ আর্ধেক দখল হয়ে আছে। কিছুদূর গিয়ে একটা বস্তি। সরু পায়ে চলা পথ। একজন বলল, "সামনে যমুনা।" নোংরা আবর্জনা মাড়িয়ে যে নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়ালাম তাকে নদী বলা যায় কি না সেটা ভাববার বিষয়। বালি কাদা পেরিয়ে যে জলস্রোত বয়ে চলেছে তাতে একদিন রাধা কৃষ্ণ জলকেলি করতেন ভাবতেই শরীর অস্থির হয়ে উঠল। কলকাতার বুকে যে দু'তিনটি খাল বয়ে চলেছে, তার চেয়ে সামান্য বড়ো। এক সার

নৌকা বাঁধা। চার-পাঁচটা ছেলে নৌকায় বসে খেলা করছে। আমায় দেখেই একটা ছেলে বলে উঠল, "নৌকায় যাবে?"

বাচ্চাগুলোর কারোরই বয়স আট-নয়ের বেশি নয়। হাসতে হাসতে বললাম, "তোদের সঙ্গে যাই, তারপর মাঝ নদীতে গিয়ে নৌকা উলটে যাক আর কি।"

বাচ্চাগুলোর সে কী হাসি। বলল, "তুমি এস, নৌকা উলটোবে না।"

"সাহস হয় না।"

রোগা চেহারার একজন লোক এসে দাঁড়ায়। আমার দিকে চেয়ে বলল, "কী হল বাবু? নৌকায় চড়বেন?" কী বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। হয়তো আমার দ্বিধা দেখে লোকটি বলল, "সংগমে যাবেন?"

বললাম, "কতদূর?"

"পাঁচ কিলোমিটার।"

প্রয়াগের প্রাণ সত্ত্বা গঙ্গা যমুনা আর অদৃশ্য সরস্বতীর সংগম। সেই পুণ্য ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে দেশ বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ আসেন। পবিত্র সংগমে স্নান করেন। বিশ্বাস চরম মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে এই স্নানে। মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা না থাকলেও সংগম দর্শনের ইচ্ছা বহুদিনের। জিজ্ঞাসা করলাম, "কত টাকা লাগবে?"

সহজ ভাবে লোকটি বলল, "পাঁচশো টাকা। বুঝতে পারছেন পাঁচ পাঁচ দশ কিলোমিটার রাস্তা। সব ঘুরিয়ে দেখা। কুম্ভের সময় শুধু স্নান করার জন্য নৌকা ভাড়া নিই পাঁচশো টাকা।"'

মনে হল মানুষটা বেশি কিছু বলেনি। দুই তীরের কত কিছু দেখা যাবে। বললাম, "কখন যাবেন?"

"কাল সকাল সকাল চলে আসুন। বেলা হলে রোদে কষ্ট হবে।"

মিশনে ফিরে আসি। মন্দিরে আরতি আরম্ভ হয়েছে। ধ্যানমগ্ন পরিবেশ। মিশনে সকালের জলখাবার দেওয়া হয় সাতটায়। বললাম, "আটটার মধ্যে চলে আসব।"

বালির চর পেরিয়ে ডান দিকে এক সার টিনের চালার ঘর। সেই দিকে দেখিয়ে লোকটা বলল, "ওখানে একটা নিম গাছ আছে। তার সামনে আমার ঘর। কাউকে মুন্বাই-এর ঘর বললে দেখিয়ে দেবে।"

বুঝলাম মানুষটার নাম মুন্বাই। বললাম, "এই নাম কে দিল?"

এক গাল হাসি ছড়িয়ে মুন্বাই বলল, "ছোটবেলায় খুব ইচ্ছা ছিল মুন্বাই গিয়ে সিনেমার নায়ক হব। তাই বন্ধুরা ক্ষেপাত মুন্বাই বলে। সেই থেকে সকলে ডাকতে আরম্ভ করল।"

মজা করে বললাম, "মুন্বাই গিয়ে নায়ক হওয়া আর হল না।"

পলকে মুন্বাইয়ের মুখটা কেমন করুণ হয়ে গেল। বলল, "সব ভাগ্য বাবু। জীবনে কিছু করতে পারলাম না।"

বুঝলাম মানুষটার দুঃখের জায়গায় ঘা দিয়ে ফেলেছি। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "দুঃখ করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সন্ধে হয়ে এসেছিল। কথা বলতে বলতে বড়ো রাস্তায় এসে পড়েছিলাম। বড়ো নোংরা আর ঘিঞ্জি পরিবেশ। রামকৃষ্ণ মিশনে ঢুকতেই অন্য পরিবেশ। আরাত্রিক ভজন শুরু হয়েছে। সন্ন্যাসীদের সমুধুর কণ্ঠস্বরে গোটা মন্দির গমগম করছে। কতদিন আগে স্বামীজি এই গানে সুর দিয়েছেন। আজ তা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। আরতির পর এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আলাপ হল। মুখ দেখে মনে হল যেন সদ্য

ত্রিবেণী সংগম

কৈশোর অতিক্রম করেছেন। সাদা কাপড়, সাদা জামা। ন্যাড়া মাথা। উজ্জ্বল দুটি চোখ। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। পাটনায় বাড়ি। বাবা মায়ের এক সন্তান। চেহারায় প্রাচুর্যের ছাপ। কেমন অদ্ভুত লাগে। কীসের আকর্ষণে এরা সব ছেড়ে সন্ন্যাসের কঠোর জীবন বেছে নেয়? কী পায় কে জানে?

সকালে চিড়ের উপমা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তাঘাট ফাঁকা। বিহার উত্তরপ্রদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে একটা জিনিস চোখে পড়েছে। মানুষজনের কাজকর্ম শুরু হয় একটু বেলা করে। নভেম্বর মাস পড়ে গিয়েছে। বাতাসে গরম ভাব নেই। দোকান পাঠ অল্প অল্প করে খুলতে আরম্ভ করছে। রাস্তা পেরিয়ে গঙ্গার দিকে বস্তির সামনে এসে দাঁড়ালাম। পরপর ঘর। মাঝখানে নিম গাছ। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মুন্বাইয়ের ঘর কোনটা?"

লোকটা বলল, "আপনি সংগমে যাবেন?"

"হ্যাঁ।"

"একটু দাঁড়ান, আমি মুন্বাইকে ডাকছি। আমার ছোটো ভাই।"

বোধহয় আমার গলা পেয়েছিল। ডাকার আগেই সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মুন্বাই। জামা কাপড় পরা। বুঝলাম ও তৈরি হয়ে আছে। বলল, "চলুন বাবু।"

চঞ্চলকুমার ঘোষ: জন্ম কলকাতায়। ছেলেবেলা কেটেছে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে। কৈশোর থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। বারো বছর বয়সে প্রবন্ধ রচনার জন্য জীবনের প্রথম সাহিত্য পুরস্কার পান। প্রথম বই 'ভারতের উপকথা'। প্রথম মৌলিক উপন্যাস 'জগন্নাথ তোমাকে প্রণাম'-এর জন্য পান আনন্দবাজার ন্যাশনাল ইন্সিয়োরেন্স শারদ অর্ঘ্য সম্মান পুরস্কার। আন্তর্জাতিক বইমেলার তরফে ২০১০ সালে পান সমকালীন শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতিমান সাহিত্যিক সম্মান। প্রকাশিত উপন্যাস: 'প্রবাহ', 'অরণ্য', 'তমসো মা', 'চিড়িয়াখানা' ইত্যাদি।

বালি পেরিয়ে অনেকখানি বালির চর। এত নোংরা যে সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। বুঝতে পারলাম বস্তির লোকেরাই এই অপকর্ম করেছে। ছোটো নদী যমুনা। এপার ওপার সাঁতরে পার হওয়া যায়। ঘাটে সার সার দিয়ে নৌকা বাঁধা। লোকজন নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, "এত নৌকা কাদের?"

একটা নৌকার দড়ি খুলতে খুলতে মুন্বাই বলল, "সব জেলে নৌকা। মাছ ধরে। উৎসবের সময় সংগমে ভাড়া খাটে।"

নৌকায় উঠে বসলাম। মুন্বাই নৌকা ঠেলে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসল। একেবারে শান্ত নদী। কোনও উচ্ছ্বাস আবেগ নেই। নৌকা ভেসে চলে। মাঝনদীতে আসতেই কেমন আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হল এই যমুনার তীরে একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালকদের সঙ্গে কত লীলা করছেন। ছেলেবেলায় পড়া একটা কবিতার লাইন আজও ভুলতে পারিনি।

"আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক,
যদি পরজন্মে পাই রে হতে ব্রজের রাখাল বালক।"

অল্পদিন আগে বৃন্দাবনে গিয়ে মনে হয়েছিল আর সে ব্রজ নেই, সবটাই আধুনিক এক শহর। সবই কালের ধর্ম। যা হারিয়ে গিয়েছে তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। সামনে যমুনার উপর বড়ো ব্রিজ। যমুনার বাঁদিকে নতুন নতুন ঘাট তৈরি হচ্ছে। বিরাট কর্মযজ্ঞ। সামনের বছর কুম্ভমেলা। কোটি মানুষের সমাগম হবে। তারই প্রস্তুতি চলেছে। একটা ঘাট দেখিয়ে মুন্বাই বলল, "এটা অমিতাভ বচ্চন তৈরি করে দিচ্ছেন। সকলেই চায় পুণ্য অর্জন করতে। সে সাধারণ মানুষ হোক বা বিখ্যাত অভিনেতা হোন।"

বললাম, "তোমাদের জন্য কেউ কিছু করেন না?"

মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল মুন্বাইয়ের। আস্তে আস্তে বলল, "আমরা আগেও যা ছিলাম এখনও তাই আছি। কেউ আমাদের কথা ভাবে না।"

দাঁড় টানছিল মুন্বাই। শরীর জুড়ে অপূর্ব সুন্দর ছন্দ ফুটে উঠেছিল। নদীর তীরে একটা ভাঙা প্রাসাদ। পাশে ঘাট। চারদিকে ঝোপ জঙ্গল। বোঝা যায় একদিন কিছু ছিল। জিজ্ঞাসা করার আগেই মুন্বাই বলল, "বহুদিন আগে ওখানে বড়ো ঘাট ছিল। দূর দূর থেকে লোকে নৌকা নিয়ে ওই ঘাটে নৌকা ভিড়ত। মাল কেনা বেচা হত।"

বললাম, "তুমি দেখেছ?"

"বুজুর্গ লোক বলে তারা তাদের বাপ ঠাকুরদার কাছে শুনেছে।"

বললাম, "আমি শুনেছি সম্রাট আকবর এই নদীতে জেলে মাঝি মাল্লাদের সব কর মকুব করে দিয়েছিলেন।"

সঙ্গে সঙ্গে মুন্বাই বলল, "আপনি ঠিকই শুনেছেন। সংগম থেকে দশ কিলোমিটার অবধি কোনও কর লাগে না। সরকার সে নিয়ম আজও মেনে চলে। সত্যি কথাটা হল সরকার কর নেয় না। কিন্তু তার লোকজন জুলুম করে টাকা আদায় করে। এখানকার এম এল এ'র ভাইপোর কথায় এই গোটা মহল্লার সব কিছু চলে। মাফিয়া ডন। এখানে যত নৌকা আছে সবাইকে মাসে হাজার টাকা দিতে হয়। না হলে নৌকা চলবে না।"

বললাম, "তোমরা সবাই এক জোট হয়ে পুলিশে খবর দিতে পার।"

"পুলিশেরাও টাকার ভাগ পায়। আমাদের দুজন বলেছিল টাকা দেবে না। রাতে একদল লোক এসে তাদের নৌকা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল। পুলিশের কাছে গেলাম; পুলিশ বলল, কারা ভেঙেছে নাম বল দেখছি। সবার নাম জানতাম। বলার উপায় ছিল না। তাহলে হয় নৌকা নয় আমাদের মাথা ভাঙবে।"

মনে হল এই ছবি শুধু সিনেমায় নয় সারা দেশের সর্বত্রই। সিনেমায় নায়ক আসেন ভগবান কৃষ্ণের মতন। বাস্তবে নেতা মন্ত্রী অনুচররা প্রতিদিন সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করে চলেছে, বাস্তবে কোনও কৃষ্ণ নেই প্রতিকার করবে। বললাম, "সারা বছর তোমাদের নৌকা চলে?"

"বর্ষার সময় নদীর জল খুব বেড়ে যায় তখন নাও বন্ধ থাকে। নয়তো কম বেশি সারা বছর আমরা মাছ ধরি। তবে যমুনায় আগে অনেক রকম মাছ, কচ্ছপ পাওয়া যেত। এখন অর্ধেক মাছ পাওয়া যায় না। নদী বুজে যাচ্ছে। শহরের সব নোংরা ভেসে আসছে। জানি না পরে কী হবে?"

কিছু বলার ছিল না। অল্প দিন আগেই দেখেছি গঙ্গার কী করুণ অবস্থা কানপুরে। এই ভাবে আর কতদিন চলবে কে জানে। নৌকা এগিয়ে চলে। প্রায় সংগমের কাছে এসে পড়েছিলাম। চোখে পড়ছিল দূরে কত নৌকা ভাসছে। সকলেই এসেছে পবিত্র সংগমে স্নান করে জীবনের সব পাপ খণ্ডন করতে। আমাদের মহাকাব্যে পুরাণে, সাহিত্যে, রয়েছে তীর্থরাজ প্রয়াগের কথা। হিন্দু পুরাণে বলা হয়েছে ভারতবর্ষের সব তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই প্রয়াগ। এখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নিত্য বিরাজ করেন। বলা হয় ব্রহ্মা দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে। মহাভারতে আছে বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা করে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবরা এখানে স্নান করেছিলেন। বলা হয় গঙ্গা যমুনার সংগমে যিনি স্নান করেন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের সকল পুণ্য লাভ করেন। মহাভারতে প্রয়াগের কথা রয়েছে। অনুমান এই পৌরাণিক তীর্থের আনুমানিক বয়স প্রায় দুই হাজার বছরেরও বেশি। বেশিরভাগ তীর্থ কালের নিয়মে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোনোকালেই তীর্থ প্রয়াগ লুপ্ত হয়নি। অতীতে যেমন ছিল, আজও আছে তেমনই। পরিবর্তন হয়েছে শুধু চারপাশের পরিবেশের। ইতিহাসে প্রথম প্রয়াগের কথা পাওয়া যায় ভগবান বুদ্ধের সময় থেকে। প্রচলিত মত খ্রিঃ পূর্ব ৫৬৩ অব্দে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সময় থেকে ভারত ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে শুরু হয় আমূল পরিবর্তন। সে কালে মানে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বৌদ্ধযুগে প্রসিদ্ধ ষোলোটি মহাজনপদ বা দেশের নাম ছিল অঙ্গ, মগ, কাশী, কোশল, বৃদ্ধি, মান, চেদি, বংশ (বসা), কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেন, অশ্বক, অবন্তী, গান্ধার এবং কম্বোজ। আজকের প্রয়াগ তখন ছিল বৎস্যদেশের অন্তর্গত। ঊনত্রিশ বছর বয়েসে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে কপিলাবস্তু থেকে রাজগীর (মহাভারতীয় যুগের গিরিব্রজ), ওখান থেকে বর্তমান বুদ্ধগয়াতে যান। এখানে ছ'বছর কঠোর তপস্যার পর বোধিলাভ করেন। তারপর পুণ্যধাম বারাণসীর অদূরে সারনাথে। তার পরবর্তী কালে বৈশালী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, প্রয়াগ আরও নানান স্থানে গিয়েছিলেন উপদেশ দান এবং ধর্মপ্রচার করতে। এটা খ্রিঃ পূর্ব ছয় শতকের কথা। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে প্রয়াগ (খ্রিঃ পূর্ব ৩২১-২৯৭) ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ নগরী। এক সময় কুষাণ সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তিক নগর ছিল এই প্রয়াগ। সমুদ্রগুপ্তের

(প্রথম) রাজত্বকালেও প্রয়াগ ছিল একটি প্রধান নগরী। চন্দ্রগুপ্তের (দ্বিতীয়) রাজত্বকালে (খ্রিস্টাব্দ ৩৮০-৪১৩)-এ দেশে এসেছিলেন চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন। কয়েকজন সঙ্গীসহ মাত্র ছয় বছর ছিলেন ভারতে। সেই সময়ে তিনি এসেছিলেন প্রয়াগে। গ্রিক রাজদূত মেগাস্থিনিসের লেখাতেও প্রয়াগের নাম পাওয়া যায়। আনুমানিক ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত আলবেরুনির গ্রন্থে ভারতের যে ষোলোটি ভ্রমণ পথের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে কনৌজ থেকে দক্ষিণমুখে প্রয়াগের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। যখন বিদেশি আক্রমণ শুরু হয় ভারতবর্ষে, প্রয়াগ পাঠানদের অধিকারে আসে। পরে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের অধিকারে আসে প্রয়াগ। আকবরের রাজত্বকালে (১৫৪২-১৬০৫) তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে যে পনেরোটি সুবায় বিভক্ত করেন, প্রয়াগ তার মধ্যে অন্যতম। আকবর প্রয়াগে গঙ্গার অবস্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে কেল্লা নির্মাণ করেন। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফরাসী ব্যবসায়ী জ্যাঁ বাতিস্ত তাভের্নিয়ে (১৬০৫-১৬৮৯) এসেছিলেন প্রয়াগে। তখনকার দিনে প্রয়াগের গঙ্গা পার হওয়ার জন্য লাগত অনুমতি পত্র। তিনি লিখেছেন, "পরের দিন সকাল থেকে ভরদুপুর পর্যন্ত গঙ্গার কূলে হা পিত্যেশ বসে থাকার পর মসিয়ে মইলি এনে দিলেন শাসনকর্তার কাছ থেকে নদী পার হওয়ার অনুমতিপত্র। চড়লাম তখন এক বড়ো নৌকায়, এলাম গঙ্গার অন্য পাড়ে। নদীর দু'কূলেই রয়েছেন একজন করে দারোগা, অনুমতিপত্র ছাড়া উপায় নেই কারও এপার ওপার হবার। কী ধরনের পণ্য সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নজর রাখেন তার ওপরে। (ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত, সংকলন : প্রেমময় দাশগুপ্ত)

প্রায় পাঁচশো বছর আগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন প্রয়াগে। আর এসেছিলেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ। তিনি মোট দু'বার এসেছিলেন। ১৮৬৩ সালে প্রথমবার মা'কে নিয়ে এসেছিলেন। তখন সবে মাত্র এই পথে রেল চালু হয়েছে। এর পরে ১৮৬৮ তে মথুরবাবুর সঙ্গে এসেছিলেন বেনারস। সেখান থেকে প্রয়াগে আসে। সকলে মাথা ন্যাড়া হন। ঠাকুর মাথা ন্যাড়া করেননি। আমরা যমুনার পথ বেয়ে সংগমের অদূরে এসে পড়েছিলাম। হিমালয়ের যমুনোত্রীতে জন্ম নিয়ে কত পথ পেরিয়ে দিল্লি মথুরা বৃন্দাবন হয়ে অবশেষে প্রয়াগে এসে যমুনা হারিয়ে গিয়েছে গঙ্গার বুকে। খানিক আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। মুম্বাইয়ের ডাকে মুখ ফেরালাম, "দেখুন বাবু আকবরের দুর্গ।" যমুনার পাড়ে বিরাট অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছে বিশাল দুর্গ। কয়েক মানুষ উঁচু পাঁচিল। তার ভিতরে প্রাসাদের মতো সম্রাট আবাস। সম্রাট আকবর ১৫৭৫-এ আসেন প্রয়াগে। প্রতিরক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে যমুনার পশ্চিম তীরে গড়ে তোলেন এই দুর্গ। দুর্গের চারদিক বুরুজ আর লাল পাথরের সাত মিটার উঁচু ইটের প্রাচীরে ঘেরা। তিন দিকে প্রবেশ দ্বার। চার মহলা দুর্গের প্রথম মহলটি ছিল সম্রাটের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য, দ্বিতীয় মহলটি বেগমদের আর তৃতীয় আত্মীয়-পরিজন অতিথিদের, চতুর্থটি সেনাদের। আকবর-নামায় যে তথ্য মেলে তাতে জানা যায়, পাঁচটি কুয়ো, কুড়িটি আস্তাবল, সাতাত্তরটি তহখানা, একটি বাওলিও ছিল দুর্গে। পরবর্তী কালে ব্রিটিশের দখলে যায় দুর্গ। যমুনার দিকে দুটি দরজা ছিল। সে দুটি বন্ধ করে দেয় ইংরেজরা। দুর্গ গড়ার আগে থেকেই এই দুর্গে ছিল কাম্যকূপ। প্রচলিত বিশ্বাস কিছু কামনা করে কূপের জলে প্রাণ দিলে পরজন্মে সে কামনা পূরণ হত। একটি সুন্দর উপকাহিনিও আছে কাম্যকূপ আর অক্ষয়বট নিয়ে। কিংবদন্তি, মুকুন্দ ব্রহ্মচারী দিল্লিশ্বর হওয়ার কামনা করে কাম্যকূপে মৃত্যু বরণ করেন। পরের জন্মে তিনি দিল্লিশ্বর আকবর রূপে জন্ম নেন। বহু মানুষ এখানে আত্মহত্যা করত। সেই জন্যে আকবর কূপটি বুজিয়ে ফেলেন। আর ছিল কূপ লাগোয়া অক্ষয়বট। মোক্ষলাভের জন্য বহু মানুষ এই অক্ষয়বট থেকে যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিত। এই অন্ধ সংস্কার থেকে মানুষের জীবন বাঁচাতে গাছটি কেটে ফেলেন দিল্লিশ্বর। ইতিহাসের কথা ভাবতে ভাবতে দূর অতীতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। মুম্বাইয়ের কথায় চেতনার জগতে ফিরে আসি। "বাবু আগে আমরা দুর্গে যাব।" নৌকা তীরে ভেড়ায় মুম্বাই। আশপাশে আরও নৌকা বাঁধা। নদীর মাঝখানে কত নৌকা ভাসছে। তীর্থযাত্রীরা সংগমে স্নান করবেন। আমি আর মুম্বাই তীরে নেমে আসি। সামনে চওড়া বাঁধানো রাস্তা ঘুরে ঘুরে দুর্গের মধ্যে গিয়েছে। এখন দুর্গের বেশিরভাগটাই মিলিটারিদের অধীনে। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কিছুদূর গিয়ে দুর্গের পাতালপুরী মন্দিরে বাঁদিকে দু'টি বটবৃক্ষের গুঁড়ি রাখা। দেখলাম সকলে সেখানে প্রণাম করছে। একজন পূজারি গোছের লোক সেখানে বসে বলছে এই আসল অক্ষয়বটের গুঁড়ি। গ্রামের মানুষ সরল মনে তাই বিশ্বাস করে প্রণাম করছে, প্রণামি দিচ্ছে। সামনে শিব মন্দির। শিব ছাড়াও নানান হিন্দু পুরাণের নানান দেবদেবীরও সমাবেশ ঘটেছে সেখানে। কালোপাথরে রাজা যুধিষ্ঠিরও রয়েছেন সিঁড়ির নীচের দিকে। রয়েছে ঔরঙ্গজেবের তরবারির আঘাতে ফেটে যাওয়া খয়েরি রঙের সিদ্ধনাথ বা প্রয়াগেশ্বর শিব। আরও দু'-একটি মন্দির রয়েছে আশপাশে। দুর্গ ঘুরে বেরিয়ে আসি। অনেক দূর পর্যন্ত উন্মুক্ত প্রান্তর। সার দিয়ে বাস গাড়ি দাঁড়িয়ে। পর্যটকরা এসেছেন। চলতে চলতে মুম্বাই বলল, "কুম্ভের সময় গোটা অঞ্চল জুড়ে তাবু আর সার সার টিনের চালা, আর লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়। আর দু'এক মাস পর মেলার কাজ শুরু হয়ে যাবে। সামনের বছর মেলা। পারলে চলে আসুন।"

"দেখা যাক যদি মা গঙ্গার ইচ্ছা হয় আসব।" আবার নৌকায় এসে উঠি। মুম্বাই দড়ি খুলে লগি বেয়ে নৌকা এগিয়ে নিয়ে যায়। "এবার কোথায় যাব?" জিজ্ঞাসা করি।

নৌকা বাইতে বাইতে মুম্বাই বলে, "আপনি গঙ্গায় স্নান করবেন তো?"

গঙ্গায় স্নান করে পুণ্যর্জনের ইচ্ছা আমার আমার কোনোদিনই ছিল না। বললাম, "মিশনে স্নান সেরে এসেছি।"

মুম্বাই সহজ ভাবে বলল, "তাতে কী হয়েছে। সংগমে এলে সকলে স্নান করে।"

"আমি আর কোনও পোশাক নিয়ে আসিনি।"

"তাতে কী হয়েছে। কত মানুষ সব খুলে স্নান করে। এখানে কেউ কিছু ভাবে না।"

হেসে ফেললাম, "আমাকেও নাগা সন্ন্যাসী হতে হবে।"

মুচকি হাসে মুম্বাই। পাশে রাখা ঝোলা থেকে একটা গামছা বার করে। বলে, "এটা পরে নেবেন।"

বুঝলাম মুম্বাই আমাকে স্নান না করিয়ে ছাড়বে না। নৌকা যমুনা পেরিয়ে মাঝ গঙ্গায় এসে পড়েছিল। চারদিকে নৌকা। বেশির ভাগ নৌকার পাশে কাঠ বাঁধা। সেখানে বসে ছেলে মেয়ে স্নান করছে।

আমি জামা প্যান্ট ছেড়ে গামছা পরে নিলাম। মুম্বাই এক লাফ দিয়ে জলে নেমে পড়ল। মনে হল এখানে বেশি জল নেই। আমি নৌকার ধারে এসে বসেছি। মুম্বাই আঁজলা ভরে জল তুলে আমাকে স্নান করিয়ে দিল। মনে হল এই স্নানে আমার চেয়ে তার আনন্দই বেশি। চড়া রোদে গঙ্গার জলে শরীরটা জুড়িয়ে গেল। বেলা বাড়ছিল। ফেরার পথ ধরে মুম্বাই। ঘাটে এসে নামি। কয়েকটা বাচ্চা ছুটে আসে। বুঝতে পারি মুম্বাইয়ের বাচ্চা। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার ছেলে মেয়ে?"

হাসে মুম্বাই। "আমার চার ছেলে এক মেয়ে। আসলে আমার বউ-এর ইচ্ছা ছিল একটা মেয়ের। আমারও খুব ইচ্ছে। তাই চার ছেলের পর এক মেয়ে।"

বছর ছয়েকের মেয়ে। বড়ো ভালো লাগল মুম্বাইয়ের কথা শুনে। যে বিহার, উত্তরপ্রদেশে জন্মের আগেই কন্যা সন্তানদের ভ্রূণ হত্যা করা হয়; সেখানে মুম্বাই যেন অন্য গ্রহের জীব।

এক রাগী মহিলা

পরদিন কিছু একটা উপলক্ষ্য ছিল। সরকারি ছুটি। এলাহাবাদ মঠের এক মহারাজ বললেন, "যান বিন্ধ্যাচল ঘুরে আসুন। মা বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির রয়েছে ওখানে। গেলে ভালো লাগবে। সকালে বার হলে সব দেখে বিকেলের মধ্যে ফিরে আসতে পারবেন। দিনে দিনে ঘোরা হয়ে যাবে।"

বিন্ধ্যাচলের কথা কিছু কিছু শুনেছি। আবার কবে এলাহাবাদে আসা হবে জানি না। এলেও যাওয়া হবে কি না ঠিক নেই। বললাম, "যাব মহারাজ।"

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আটোতে চড়ে বাস স্ট্যান্ড। বাসে এত ভিড় দুটো বাস ছেড়ে তৃতীয় বাসে বসার জায়গা মিলল। যত মানুষ বসে তার চেয়ে বেশি দাঁড়িয়ে। এক পাশে অল্পবয়সি একটি বউ। কোলে বাচ্চা। সঙ্গে আরও তিনটে বাচ্চা। বড়োটা ছয় সাত বছর, পরেরটা পাঁচ, তৃতীয়টা তিনের বেশি নয়। পেছনে তাদের বাবা। গ্রাম্য চেহারা গোবেচারি মুখ। বাস ছাড়তেই তৃতীয়টা কেঁদে উঠল। তার কান্না শুনে পরেরটাও কান্না আরম্ভ করে দিল। সংক্রামক রোগের মতো কোলেরটাও কাঁদতে শুরু করে দিল। বাসের বেশিরভাগ মানুষই বিরক্ত। নানান জনের নানান উপদেশ। "জল খাওয়াও।" "জানলার পাশে বসিয়ে দাও।" "এত বাচ্চা নিয়ে বাসে ওঠে?" "বিন্ধ্যাচল এত দূরের রাস্তা, পরের বাসে যেতে পারতে।" যাদের উদ্দেশ্যে এত উপদেশ, সেই স্বামী স্ত্রী নির্বিকার ভাবে বাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত। খানিক পরেই কোলের বাচ্চাটা অপকর্ম করে ফেলল। হাঁহাঁ করে ওঠে আশপাশের লোকজন। একটু সরে যেতেই মেঝের উপর বসে পড়ল বউটা। বাবা ব্যাগ থেকে কাগজ বার করে বাচ্চার পাছা মুছিয়ে জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। মায়ের পাশে বাচ্চারাও বসে পড়ে। অনেকক্ষণ বসে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। আচমকা বিচ্ছিরি একটা শব্দ আর ঝাকানিতে চমকে উঠি। বাস দাঁড়িয়ে পড়েছে। কী হয়েছে? সকলের মুখে এক প্রশ্ন। গাড়ি পরীক্ষা করে ড্রাইভার। তারপর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা উৎকণ্ঠিত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, "গাড়ি যাবে না। ইঞ্জিন খারাপ।"

"আমরা কী করে যাব?"

ড্রাইভার কনডাক্টর নির্বিকার ভাবে বিড়ি ধরায়। এই জিজ্ঞাসার উত্তর তাদেরও জানা নেই। মাঝপথে বাস ভর্তি লোক দাঁড়িয়ে। দু'ধারে মাঠ। দূরে কয়েকটা বাড়ি চোখে পড়ছিল। ব্যাগ কাঁধে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। সাত-আট মিনিট গিয়ে কয়েকটা ঘর, দোকান। অল্প কিছু লোকজন। সেই কোন সকালে চা বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছি। খিদেতে পেট চনচন করছে। রাস্তার উলটো দিকে একটা মিষ্টির দোকান। দোকানি মাঝবয়সি এক মহিলা। চেহারায় রসকষের কোনও চিহ্ন নেই। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মহিলা বললেন, "মিষ্টি খাবেন। ভালো মিষ্টি আছে।"

একেবারে ভাঙা কাঁসির মতোন কণ্ঠস্বর। দোকান আর মিষ্টির চেহারা দেখে মনে হল কতদিন আগে মিষ্টি তৈরি হয়েছে কে জানে। কিছু করবার নেই। চারটে লাড্ডু নিয়ে সামনের বেঞ্চে বসলাম। খারাপ বাসের লোকজন এসে পড়েছে। তার মধ্যে বাচ্চা নিয়ে স্বামী স্ত্রীও এসেছে। দুটো বাচ্চা জুলজুল করে মিষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে। মায়ের হাত ধরে কিছু বলতেই মা ধমকে ওঠে। একটা বাস আসে। পাদানিতে লোক ঝুলছে। বাস দাঁড়ায় না। লোকজন আসে। মিষ্টির দোকানে বিক্রি হয়। বছর পনেরোর একটা ছেলে দোকানের কর্মচারী, মিষ্টি দেয় আর ছোটাছুটি করে। এক মিনিট দাঁড়ালেই দোকানের মহিলা খিঁচিয়ে ওঠেন। আধঘণ্টার উপর দাঁড়িয়ে আছি। আরেকটা বাস আসে। ধাক্কাধাক্কি করে কয়েকজন উঠে পড়ে। বাচ্চাদের নিয়ে দুজন এগিয়ে গিয়েও ফিরে আসে। খিদেতে বাচ্চারা কাঁদতে থাকে। মা উঠে এসে বলে, "একটু জল পাওয়া যাবে?"

মহিলা বলেন, "রামু, জল দে।" বউটা কেমন কুঁকড়ে যায়।

"কোথায় যাবে?" জিজ্ঞাসা করেন মহিলা।

"বিন্ধ্যাচল।"

"এই চারটে বাচ্চা নিয়ে?"

লজ্জা পায় বউটা। পাশে দাঁড়িয়ে বর বলে, "সব ভগবানের দান। কী করব?"

কেমন একটা বিরক্তি ফুটে উঠল দোকানি মহিলার মুখে। "একটার খাবার জোগাড় হয় না, চারটে। বলিহারি যাই শখের।"

বর বউ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। আরেকটা বাস আসে। প্রায় সব লোকেই ঝুলতে ঝুলতে উঠে পড়ে। এখনও এক ঘণ্টার রাস্তা। এইভাবে যেতে সাহস হয় না। কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বড়ো ছেলেটা এদিক ওদিক ঢিল ছোঁড়ে। মহিলা চিৎকার ওঠেন, "এখান থেকে বাচ্চাকে সরিয়ে নিয়ে যাও। কাচ ভেঙে গেলে পয়সা দেবে?"

বাচ্চাদের নিয়ে রোদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় স্বামী স্ত্রী। কেমন মায়া লাগে। কী করে ওরা বিন্ধ্যাচল যাবে ভেবে পাই না। কত গাড়ি চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়। একটা ট্রেকার, হাত দেখাতেই দাঁড়িয়ে পড়ে। ড্রাইভার আর একজন। তাড়াতাড়ি বলি, "বিন্ধ্যাচল যাব।"

ড্রাইভার বলে, "একশো টাকা লাগবে।"

বাচ্চাদের বাপ এগিয়ে আসে। "কত নেবে বাবু বিন্ধ্যাচল?"

"ক'জন?"

"দুজন।"

ড্রাইভার একপলক দেখে নিয়েছে। আঙুল তুলে বলে, "ওই বাচ্চারা?"

কোনও জবাব দেয় না লোকটা। ড্রাইভার নির্বিকার ভাবে বলে,

"তিনশো টাকা লাগবে।"

লোকটা কেমন গুটিয়ে যায়। হাতজোড় করে, "দুশো টাকা আছে। পুজো দেব। ঘরে ফিরব।"

দোকানের মহিলা বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ বললেন, "কত লাগবে?"

ড্রাইভার কিছু ভাবল। বলল, "ঠিক আছে বাচ্চাদের ভাড়া লাগবে না। দুজনের তো লাগবে। দুশো টাকা।"

"কম হবে না?" বিরক্তিতে জিজ্ঞাসা করে মহিলা।

"হবে না।" সোজা সাপটা উত্তর ড্রাইভারের। বুঝে নিয়েছে লোকে টাকা দেবেই। এখানে আর কিছু পাওয়া যাবে না।

মহিলা সোজা দোকানের ভিতরে ঢুকে গেলেন। বাক্স থেকে দু'খানা একশো টাকার নোট বার করে এনে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বললেন, "ওদের নিয়ে যাও।"

বাপের পাশে বাচ্চাদের মা'ও এসে দাঁড়িয়েছিল। দুজনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মহিলা কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন, "দাঁড়িয়ে আছ কেন? গাড়িতে গিয়ে বসো।"

হাত জোড় করে বাচ্চাদের বাপ। তারপর সোজা উঠে পড়ে সবাই। আমি সামনে বসি। বাকি সবাই পিছনে। ট্রেকার ছাড়ে। জানলা দিয়ে মুখ ফেরাই। রাগী মহিলা ধীর পায়ে দোকানে ফিরে চলেছে।

কই তকলিফ নেই হোগা

বড়ো রাস্তায় এসে গাড়ি থামে। পথের পাশে একটা বোর্ডে হিন্দি আর ইংরেজিতে লেখা বিন্ধ্যবাসিনী মন্দির। নেমে পড়ি সবাই। চার বাচ্চার মা বাপ ছাড়াও আরও কয়েকজন লোক। হাতে পুজোর জিনিসপত্র। বুঝতে অসুবিধে হয় না সকলে মন্দিরে চলেছে। আমিও তাদের পিছনে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ফাঁকা রাস্তা মাঠের মধ্যে গিয়ে গিয়েছে। বাড়ি ঘর চোখে পড়ে না। ঝোপ জঙ্গল চড়াই উৎরাই। খানিক দূর হয়ে লোকালয় শুরু হয়েছে। দু'-একটা দোকানঘর। পুজোর জিনিস সাজানো। গ্রাম্য বাড়িঘর। আর কিছু দূর গিয়েই মন্দিরের রাস্তা শুরু হয়েছে। এদিকটায় জন বসতি। পথের দু'ধারে বাড়ি দোকান। মোটামুটি আর সব তীর্থস্থানের মতো একই ছবি। এগারোটা বাজে। লোকজনের খুব বেশি ভিড় নেই। যারা রয়েছেন সকলেই মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন। ছোটো মন্দির। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এলাম। বারান্দা পেরিয়ে ছোটো দরজা। ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল পাথরের বেদির উপর কাপড় আর ফুল মালা ঢাকা দেবী মূর্তি। শুধু চোখ আর মুখ ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুরোহিতকে প্রশ্ন করে জানলাম দেবী দুর্গা এখানে বিন্দুবাসিনী নামে পরিচিত। পাথরের দেবী মূর্তি। দেবীর দশ হাত। পায়ের কাছে তার বাহন সিংহ। বলা হয় একান্ন পিঠের এক পিঠ। সতীর বাঁ পায়ের একটি আঙ্গুল পড়েছিল এই ক্ষেত্রে। খুবই সাধারণ মন্দির। স্থাপত্য বা শিল্পকার্য কিছু নেই। চারদিকে লোহার রেলিং। ঘিঞ্জি পরিবেশ। মন্দিরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। সামান্য দূরে গঙ্গা। এত সংকীর্ণ একজন না বলে দিলে অন্য কোনও ছোটো নদী বলে ভেবে নিতাম। দুই তীরে ধুধু বালির চর। দেখলাম কয়েকজন গঙ্গাস্নান করে উঠে আসছেন। অনেকটা পথ এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। একটা দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে পড়লাম। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দোকানে বসে পুজোর জিনিসপত্র বিক্রি করছেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথা থেকে আসছেন?"

"কলকাতা।"

"কলকাতা থেকে অনেকে এসে এখানে পুজো দিয়ে যান। দু'দিন আগেই এক স্বামী-স্ত্রী এসেছিলেন। কালীঘাটে বাড়ি। বিয়ের পর দশ বছর কোনও সন্তান হয়নি। কেউ বলেছিল তাই এখানে এসে পুজো দিয়ে যান। পরের বছর তাদের মেয়ে হয়। সেই মেয়ে এখন দু'বছরের। তাকে নিয়ে পুজো দিতে এসেছিলেন। বড়ো জাগ্রত আমাদের মা দেবী বিন্দুবাসিনী।"

অনুভব করি সবটাই মানুষের বিশ্বাস। বললাম, "কত বছর এই দোকানে বসছেন?"

"আগে বাবা বসতেন, তারপর আমি। চল্লিশ বছর তো হয়ে গেল।"

"এত বছর এই মন্দিরে আছেন, এমন কিছু দেখেছেন যা ভুলতে পারেননি?"

ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "অনেক বছর আগেকার কথা। তখন সবে এই দোকানে বসতে আরম্ভ করেছি। বর্ষার দিন। লোকজন বেশি নেই। হঠাৎ দেখি একটা বউ ছেলে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছে। কিছু বোঝার আগেই মন্দিরে ঢুকে লুটিয়ে পড়ল মায়ের সামনে। বুঝতে পারছিলাম না কী হয়েছে। একটু পরেই দেখি আরও কয়েকজন লোক এসে হাজির। তাদের মুখে শুনলাম চার মাস আগে বউটির স্বামী মারা গিয়েছে। আজ সকালে দু'বছরের একমাত্র ছেলের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাত পা ঠান্ডা। সবাই বলছে মারা গিয়েছে। দু'মাইল দূরে গ্রামে থাকে। সেখান থেকে বাচ্চাকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছে। তার বিশ্বাস মা তার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেবে। সবাই বলছে যে মারা গিয়েছে সে কেমন করে বাঁচবে। কিন্তু বউটি কারও কথা শোনেনি। ছেলেকে মায়ের মূর্তির পায়ের সামনে নামিয়ে দিয়ে মাটিতে কপাল ঠুকতে আরম্ভ করে। দু'বার ঠুকতেই রক্ত ছিটকে গিয়ে মায়ের পায়ে পড়ে। সাথে সাথে অবাক কাণ্ড। লোকজনের চিৎকার ছাপিয়ে শোনা যায় বাচ্চার কান্না। মায়ের করুণায় বেঁচে উঠেছে অবোধ শিশু।"

চুপ করে শুনি। জানি প্রতিবাদ করে লাভ নেই। যে প্রাণ একবার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায় হাজার কান্নাতেও সে আর ফিরে আসে না। দোকানির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ি। মনে পড়ে প্রায় একশো বছর আগে শ্রী রামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই মন্দিরে এসেছিলেন। সেই সময়ে মন্দিরে প্রবেশের নানা বাধা নিষেধ ছিল। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দের তেজদীপ্ত রূপ দেখে তারা তাঁকে প্রবেশ করতে দিল। দেবীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবগ্রস্থ হয়ে পড়লেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। এখানে তিনি দু'সপ্তাহ ছিলেন। পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে শ্রীশ্রী অষ্টভূজাদেবীর মূর্তি দর্শন পান। ইচ্ছা ছিল সেই দেবী মূর্তি দর্শন করা। একজন দোকানি বললেন, "সে অনেকখানি দূর। গাইড ছাড়া যাওয়া যাবে না। আপনাকে থাকতে হবে একদিন।"

থাকা সম্ভব নয়। বেলা গড়িয়ে চলেছে। আবার এলাহাবাদ ফিরতে হবে। পথে রেলস্টেশনে খোঁজ নিই। সন্ধে সাতটার আগে কোনও

ট্রেন নেই। অগত্যা ফিরে চলি বাস রাস্তার দিকে। আমার আগে হাঁটছিল দুটি ছেলে। হাতে পুজোর ডালি। তারাও ঘরে ফিরে চলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা কোথায় যাবে?"

"এলাহাবাদ।"

বললাম, "আমিও যাব। সকালে বাসে যা ভিড় দেখেছি, কী করে যাব বুঝতে পারছি না।"

একটি ছেলে বলল, "চিন্তা করবেন না আমরা আপনাকে পৌঁছে দেব।"

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ছেলে বলে উঠল, "আপকো কই তাকলিফ নেহি হোগা।"

ভালো লাগলো ছেলেটার কথা শুনে। বড়ো রাস্তার ধারে ছোটো বাস স্ট্যান্ড। কোনও লোকজন নেই। আমরা তিনজন গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা ভাঙাচোরা চায়ের দোকান। খিদে পেয়ে গিয়েছিল। বুড়ো দোকনি। বললাম, "তিনটে চা দাও।"

বেশি কেনাবেচা হয় বলে মনে হলো না। উনুন নিভে গিয়েছে। দোকানি বলল, "একটু দেরি হবে বাবু।"

একটা বাস আসে। ছাদে মানুষ, দরজায় ঝুলন্ত মানুষ। ছেলে দুটো হাত দেখালো। থামে না বাস। চোখের সামনে দিয়ে হুহু করে বেরিয়ে যায়। কী করে যাব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ছেলে দুটো বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। হাসি মুখে বলল, "আপকো কই তাকলিফ নেহি হোগা। আরামসে পৌঁছ দেগা।"

ভরসা করে থাকি। আর একটা বাস আসে, তার সামনে-পেছনেও লোক ঝুলছে। হাত দেখাই। থামে না। একটা ছেলে বলল, "মির্জাপুর থেকে বাস আসে। ওখানেই লোক ভর্তি হয়ে যায়। মাঝ রাস্তায় ওঠা খুব কষ্ট।"

বিকেল হয়ে এসেছিল। ভাবনা শুরু হয়ে গেল। আর কিছু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। নতুন জায়গা কী করে বাড়ি ফিরবো জানি না। ছেলে দুটোকে সে কথা বলতেই সেই এক কথা, "আপকো কই তাকলিফ নেহি হোগা। আরামসে পৌঁছ দেগা।"

চুপ করে থাকি। পনেরো কুড়ি মিনিট অন্তর বাস আসে। তিনটে বাস বেরিয়ে যায়। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি। একটা বাস আসছিল। হঠাৎ দেখি ছেলে দুটো তিরের মতো ছুটতে আরম্ভ করেছে, আমিও তাদের পেছনে ছুটতে আরম্ভ করলাম। বাসের পিছনে একটা প্রাইভেট কার। হাত দেখিয়ে তাকে থামিয়েছে দুজন। জানালা দিয়ে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে কিছু বলে। তারপরই চেঁচিয়ে ওঠে, "চলে আসুন বাবু।" কিছু বোঝার আগেই একরকম প্রায় জোর করেই আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে দুটো ছেলে উঠে পড়ে। ড্রাইভারের মুখ দেখে মনে হল তার খুব একটা ইচ্ছে নেই আমাদের নিয়ে যাওয়ার। ছেলেটা বলল, "দেড়শো টাকা দেব। চল চল।"

এবার আর না বলে না ড্রাইভার। পিছনে দোকানি গলা শুনতে পাই, "বাবু, চা।"

ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। সিটে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। প্রায় দু'ঘণ্টার রাস্তা। সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘটাং ঘটাং আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। যমুনা ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। আগের দিন এই ব্রিজের তলা দিয়ে নৌকায় করে সংগমে গিয়েছি। বুঝতে পারি এলাহাবাদ শহরে গাড়ি ঢুকছে। আচমকা একটা বিচ্ছিরি শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা।

"কী হয়েছে? একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি সবাই।"

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে ড্রাইভার। একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলে ওঠে, "টায়ার পাংচার হো গিয়া।"

আমরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছি। ব্রিজের মাঝখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে। এখান থেকে কী করে ঘরে ফিরব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ড্রাইভারের টাকা মিটিয়ে দিয়ে বললাম, "রামকৃষ্ণ মিশন কী করে যাব?"

সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে বলল, "আপকো কই তাকলিফ নেহি হোগা। আরামসে পৌঁছা দেগা।"

ওদের সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। চারদিকে আলো জ্বলছে। ব্রিজ পেরিয়ে গলির রাস্তা ধরে এ গলি সে গলি পেরিয়ে একসময় দেখি মিশনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। বলি, "তুম লোক কাহা যায়গা?"

ওরা হাসে। বলে, "দু'কিলোমিটার পিছে। আপকো লিয়ে ইধার আয়া।"

ওরা ফিরে যায়। চুপ করে চেয়ে থাকি রামকৃষ্ণ মন্দিরের দিকে। ভাবি কে জানে মন্দিরের ভিতরে যিনি আছেন তিনিই হয়তো দুই তরুণের রূপ ধরে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। গেট পেরিয়ে আশ্রমে ঢুকে পড়ি। কানে ভেসে আসে দুই তরুণের কথা, "আপকো কোই তকলিফ নেহি হোগা। আরামসে পৌঁছা দেগা।"

কুম্ভ

আর একবার গিয়েছিলাম কুম্ভমেলায়। কুম্ভের অর্থ সর্বমানবের মহামিলন। প্রবল শীত, হিমেল হাওয়া, গোটা রাত ধরে ধুলি ধূসর পায়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে চলা, বিশ্রাম নেই, মাথার উপর ছাদ নেই। খোলা আকাশের নীচে বিনিদ্র রাত জাগা। তবু কোটি কোটি মানুষ কীসের টানে এই কুম্ভে আসেন? সেই উত্তর খুঁজতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম কলকাতা থেকে এলাদাবাদে। পরিচিত এক সাধু মহারাজের সূত্রে জায়গা পেলাম তাদের আখড়ায়। ব্যবস্থা ভালোই। চারটে তাবু ভক্তদের, দুটো সাধুদের জন্য। স্নানের আগের দিন এসেছি। সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছি। কত বিচিত্র সাধু। কত বিচিত্র তাদের আচারআচরণ। এদের মধ্যে প্রকৃত মহাত্মা ক'জন আছেন জানি না, কিন্তু মানুষের ভিড় সাধুদের কাছে। তার একমাত্র কারণ বোধহয় শুধু বিশ্বাস আর বিশ্বাস। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথায় "বহু মহাত্মা আর সাধু পুরুষ আসেন এই পুণ্যভূমিতে। তাঁদের শুভদৃষ্টি একবার পড়লে জীবনের সব পাপ থেকে মুক্তি ঘটে যায়। উদ্ধার হয়ে যায় এ মরদেহ।" রাত বাড়তেই ঠান্ডা বাড়ছিল। ন'টা বাজতেই শুয়ে পড়লাম। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের বিছানায় কম্বল পাতা, গায়েও দুটো কম্বল তবু ঠান্ডা লাগছিল। বাইরে থেকে মানুষের কোলাহল। মাইকে গান ভেসে আসছিল। গোটা রাত যখনই ঘুম ভেঙেছে মানুষের চলার শব্দ শুনতে পেয়েছি। আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম। গেঞ্জি, জামা, সোয়েটার পরা। তার উপরে মোটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে। গঙ্গার স্রোত ধারার মতো মানুষের স্রোত। বেশিরভাগই দেহাতি, গ্রাম থেকে আসা নারী পুরুষ। আঠারো থেকে আশি সব বয়সের মানুষ, কাঁধে ঝোলা, মাথায় পোঁটলা নিয়ে কখন হাঁটা শুরু করেছে কে জানে।

চলতে না পারা বৃদ্ধারা সন্তানের পিঠে সওয়ার হয়েছে। পিছন থেকে মহারাজের ডাক শুনতে পেলাম, "আর কিছু পরেই আমরা বার হব।" মহারাজকে ঘিরে ইতিমধ্যেই কুড়ি পাঁচিশ জন জড়ো হয়েছে। ভোর পাঁচটায় যোগের প্রথম স্নান শুরু হবে। আগের দিন রাতে মহারাজ বলে দিয়েছেন, "সাধুদের স্নান সারা হলেই আমাদের স্নান শুরু হবে। আমরা যাব নির্বাণী আখড়ার সঙ্গে, সাধুদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই আমরা ফিরে আসব। না হলে কে কোথায় ছিটকে পড়বেন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।" পাশেই নির্বাণী আখড়া ছাড়াও অন্য সাধুদেরও তাবু রয়েছে। অনেকেই গোটা রাত খোলা আকাশের নীচে ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছেন। একটু পরেই সাধুদের আখড়া থেকে শিঙা-র শব্দ ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খের সমবেত ধ্বনি। তিনটে বাজে, মহারাজের পিছনে পিছনে বেরিয়ে পড়লাম। কাঁধে ব্যাগ, শুকনো জামা কাপড় ভরা। স্নান সেরে যদি সম্ভব হয় ভিজে পোশাক ছেড়ে ফেলব। সমুদ্রের ঢেউ এর মতো অগুন্তি মানুষ। পায়ে পায়ে শুকনো বালি উড়ছে বাতাসে। চুল মাথা ভরে যাচ্ছে বালিতে। মানুষের সার চলেছে। দুই ধারে বাঁশের বেড়া তার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। দশ পনেরো মিটার যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। নড়াচড়া নেই। কলকাতার দুর্গাপুজোর কথা মনে পড়ে যায়। একদল ঢুকে গেলেই বাঁশ দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সামনের দল বার হলে তবেই পিছনের দল আসে। দশ মিনিটের রাস্তা পার হয়ে ঠাকুরের দর্শন পেতে পুরো দু'ঘণ্টা কেটে যায়। এখানে তারচেয়েও করুণ অবস্থা। মাঝে মাঝেই রাস্তা দু'দিক তিন দিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কোনটা যে "সংগম যানে কা মার্গ" বোঝা মুশকিল। পুলিশদের জিজ্ঞাসা করলে এক একজন এক এক দিক দেখিয়ে দেয়। বেশিরভাগ পুলিশ আসে বাইরে থেকে। তারাও জানে না সংগমের রাস্তা। আমাদের ঠিক সামনে রয়েছে একদল তীর্থ যাত্রী। বেশিরভাগই মহিলা, অল্প কিছু পুরুষ। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথা থেকে আসছেন?" দেহাতি উচ্চারণে কী নাম বলল বোঝা গেল না। তার কথা শুনে এটুকু বুঝতে পারলাম মা বউকে নিয়ে কুম্ভ স্নানে এসেছে। দু'বছর আগে নাসিক কুম্ভে গিয়েছিল। ইচ্ছে আগামী বছর হরিদ্বারের কুম্ভে যাবে। থমকে গিয়েছিল আমাদের চলা। হঠাৎ দেখলাম বাঁশের বেড়ার পাশে পুলিশ ভলেন্টিয়াররা ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এগোবার পথ বন্ধ। একটু পরেই সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এলো বিশাল এক শোভাযাত্রা। সামনে একদল সাধু পরনে কৌপিন। অনেকে দিগম্বর। গলায় গাঁদা ফুলের বড়ো বড়ো মালা। সাধুদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে ঢোল, চার-পাঁচ হাত লম্বা শিঙা। মাঝখানে ঘোড়া টানা রথের উপর সিংহাসনে বসে আছেন মহামন্ডলেশ্বর। লম্বা জটা। গোলগাল চেহারা। দু'পাশে দাঁড়িয়ে দুজন চামর দোলাচ্ছে। সাধুদের কারও কারও হাতে রংবেরঙের পতাকা দেখলাম। দশ বারো বছরের দুটি বালক। মুখে হাসি। দেখে মনে হয় সাধু হওয়ার জন্যই যেন ওরা এই পৃথিবীতে এসেছে। দু'হাত তুলে মাঝে মাঝেই জয়ধ্বনি করছে, "গুরু মহারাজ কী জয়, জয় গঙ্গা যমুনা মাই কী জয়।" শত শত কণ্ঠের মিলিত উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠছে আকাশ বাতাস। শোভাযাত্রা চলেছে। এক এক দলের মহামন্ডলেশ্বরের এক এক রকম সাজ। কেউ চলেছেন হাতিতে, কেউ ঘোড়ার পিঠে। কেউ রথে। কেউ ডুলিতে শিষ্যদের কাঁধে। লোকেরা হাতজোড় করে প্রণাম করছে। অনেকে ফুল পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে সাধুদের দিকে। সাধুরাও অনেকে এগিয়ে এসে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন। জনস্রোত আবার এগিয়ে চলে। সাধুদের স্নান পর্ব সারা হতেই শুরু হয় সাধারণের স্নান। গঙ্গাযমুনার পবিত্র ধারা আজ শত শত সাধুস্পর্শে আরও পবিত্র হয়ে উঠেছে। যতদূর চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। স্ত্রী পুরুষ, সাধু গৃহী, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল গঙ্গার বুকে কোনও ভেদাভেদ নেই। মাঘের কনকনে ঠান্ডা বাতাস, তার মধ্যে বরফের মতো শীতল জল চামড়া ভেদ করে হাড়ের ভিতর অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। প্রাণ ভরে ডুব দিচ্ছে সবাই। কেউ বুক জলে দাঁড়িয়ে পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করছে, কেউ সূর্যদেবতাকে প্রণাম জানাচ্ছে। আশ্চর্য লাগে গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে গ্রামের লজ্জাশীলা গৃহবধূ পরপুরুষের গায়ে গা ঠেকিয়ে স্নান করছে। মুছে গিয়েছে সব যা সংকোচ দ্বিধা লজ্জা। সবকিছুই আজ মা গঙ্গার পায়ে নিবেদন করা হয়েছে। স্নান সেরে আসার পরই আবার মনের মধ্যে জেগে উঠছে লজ্জা সংকোচ। শুরু হয়ে যায় পর পুরুষের দৃষ্টিপাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস। ঘাটের সামনে গিয়েই থমকে যাই কলকাতার সামান্য শীতেও গরম জলে স্নান করি, আর এই ঠান্ডায় কী করে জলে নামব? ভাবনার অবকাশ পাই না। মানুষের স্রোতের টানে কেউ যেন ঠেলে আমাকে নামিয়ে দেয় মা গঙ্গার বুকে। আমাদের এই দলের একজন স্নান সেরে উঠে আসছিলেন। কোনোক্রমে তার হাতে শুকনো পোশাকের ব্যাগটি হস্তান্তর করি। জলের মধ্যে পা দিতেই মনে হলো শরীরের নিম্নাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গেল। একটু ইতস্তত করি। কেউ একজন পাশ থেকে বলল, "ডুব দাও। ডুব দাও। না হলে পুণ্য অর্ধেক হয়ে যাবে।" সব দ্বিধা কাটিয়ে "জয় মা" বলে ডুব দিই। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হল আমি যেন আমার মধ্যে নেই। কিছু বোঝার আগেই পাশ থেকে কেউ একজন মাথা ধরে চুবিয়ে দেয় জলের মধ্যে। পরপর তিনবার। এবার নিজেকে স্বাভাবিক লাগে। জল দিই সেই পিতৃপুরুষদের যাঁরা একদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন আজ তাঁরা অন্যলোকে। চারদিকে শুধু শুনতে পাচ্ছি মানুষের কলরোল আর মা গঙ্গার জয়ধ্বনি। স্নান

গঙ্গা আরতি - কুম্ভ মেলা

সেরে উঠে আসি। এই ভিড় এখন সারাদিন চলবে। কত দূর থেকে, কত কষ্ট করে মানুষ এখানে এসেছে। তবু চোখে মুখে তৃপ্তির আনন্দ। প্রশ্ন করেছি বহু মানুষকে, "কীসের জন্য এই গঙ্গাস্নান?"

একটাই উত্তর পেয়েছি, "গঙ্গাস্নানে সংসার জীবনের সব পাপ মুছে যায়। মুক্তি পায় মানুষ।"

সাধুদের প্রশ্ন করেছি, "আপনারা সংসার ত্যাগ করেছেন, জাগতিক পাপ পুণ্যের ঊর্ধ্বে গিয়েছেন, তবু কীসের জন্য এই স্নান?"

বহুজনের বহু উত্তর পেয়েছি। একজনের কথা বড়ো ভালো লেগেছিল, "গঙ্গা নারায়ণেরই এক রূপ। যখন গঙ্গার পবিত্র জলধারায় স্নান করি, সেই পরমানন্দের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাই। এর চেয়ে বেশি চাওয়ার কিছু নেই, পাওয়ার ও কিছু নেই।"

আর একজন বড়ো অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। "আমার মায়ের বড়ো ইচ্ছে ছিল কুম্ভে স্নান করবেন। আসতে পারেননি মা। তাই হরিদ্বার, নাসিক, উজ্জয়িনী যেখানেই কুম্ভ হোক, সেখানে গিয়ে মনে মনে মাকে স্মরণ করি আর জল দান করে বলি তুমি যেখানেই থাকো এই জলে স্নান করো। যখন আমি থাকব না আমার সন্তান কুম্ভে এসে আমায় জলদান করবে।" কে জানে এইভাবে হয়তো মহাকুম্ভের স্রোতধারা বয়ে চলে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে।

বারাণসী ঘাট

চিরন্তন বারাণসী

প্রথমবার এলাহাবাদে সব মিলিয়ে পাঁচদিন ছিলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের এক মহারাজ বললেন, "এবার কোথায় যাবেন?"

বললাম, "বেনারস।"

"কোথায় উঠবেন?"

"রামকৃষ্ণ মিশনে, আগে থেকে চিঠি দেওয়া আছে।"

"তাহলে কোনও অসুবিধে নেই। আগে গিয়েছেন?"

"খুব ছোটোবেলায় গিয়েছিলাম, বাবা মায়ের সঙ্গে। বিশেষ কিছু মনে নেই। বেনারস সম্পর্কে যতটুকু জানি সবটাই পুরোনো দিনের বই পত্র পড়ে জানা।"

গম্ভীর মুখে মহারাজ বললেন, "পুরোনো দিনের বেনারস আজ আর নেই। সব পালটে গিয়েছে। তবে গঙ্গার ঘাটে গেলে ভালো লাগবে। সকালে টাউন স্টেশন থেকে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়ে। বারোটার মধ্যে বেনারস পৌঁছে যাবেন।"

রাতে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখেছিলাম। ছ'টা বাজতেই বেরিয়ে পড়লাম। আশ্রম থেকে স্টেশন হাঁটা পথ। খালি ট্রেন দাঁড়িয়ে। যে কামরায় উঠলাম সবমিলিয়ে চার-পাঁচ জনের বেশি যাত্রী নেই। একটু পরেই ট্রেন ছাড়ে। কোনও তাড়া নেই চলার। ধীর গতিতে চলে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন সব স্টেশনে দাঁড়ায়। দু'-চারজন ওঠে নামে। কারও কোনও ব্যস্ততা নেই। বনগাঁ লাইনের ট্রেনের মতো হুটোপুটি নেই। শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন। লাইনের ধারে ছোটো ছোটো গ্রাম। দু'পাশে খেত। ফসলে সবুজ হয়ে আছে। এক বুড়ো-বুড়ি গাড়িতে ওঠে। নীচে দাঁড়িয়ে ছ'বছরের নাতি, পাশে মা। সবাই হাত নাড়ে। ছোটো ছোটো দৃশ্য। চিরন্তন ভারতবর্ষ। একটু দেরি করেই বেনারস পৌঁছায় ট্রেন। স্টেশনের বাইরে সার দিয়ে অটো দাঁড়িয়ে। একটা অটো ভাড়া করলাম। সোজা রামকৃষ্ণ মিশন। পথের ধারে দোকান বাড়ি বাজার বাস অটো টেম্পু। মানুষের ভিড়। মনে হল কলকাতা বড়োবাজার। বইতে পড়া বারাণসীর চিহ্নমাত্র কোথাও খুঁজে পেলাম না। রামকৃষ্ণ মিশনে যখন এসে পৌঁছালাম দুপুরে খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। ঘরের খোঁজ করতেই এক মহারাজ বললেন, "আগে খেয়ে নিন, তারপর ঘরে যাবেন।"

বড়ো একটা ঘরে সকলে খেতে বসেছে। আড়ম্বর নেই। তবে আন্তরিকতা আছে। দুপুরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেনারস মানেই গঙ্গা আর শিব। শিব আছেন মন্দিরে বন্দি। আর গঙ্গা, তাকে ঘিরেই আদি অনাদি এই শহরের সব মাহাত্ম্য। মিশন থেকে সোজা রাস্তা গিয়েছে গঙ্গার ঘাটে। লোকজন আর গাড়ির ভিড়ে পথ চলা যায় না। গোধুলিয়া'র চার মাথার মোড়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য। গাড়ি, মানুষ, ষাঁড়, কুকুর, ভিখারী, সাধু সব এক সঙ্গে চলেছে। কোনও বিবাদ নেই। পথের ধারে দোকান, ফুটপাতে দোকান, দলে দলে তীর্থযাত্রী চলেছে। আমার আগে একদল তীর্থযাত্রী চলেছে। সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের মানুষ। মেয়েরা কাছা দিয়ে শাড়ি পরা। ছেলেরা খালি গা। সব চেয়ে চোখে পড়ার মতো দৃশ্য অর্ধেক মহিলার মাথা নেড়া। বোঝা যায় এখানে এসে সদ্য মস্তক মুণ্ডন করেছে। শুনেছি তিরুপতি মন্দিরে মস্তক মুণ্ডন করে যে চুল জমা হয় তা চড়া দামে বিক্রি হয়। এখানে সে রকম কোনও ব্যবস্থা আছে কি না আমার জানা নেই। প্রায় ধাক্কা খেতে খেতে চলেছি। ভাবি এ কোথায় এলাম। পথের পাশে মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। সেখানেও মানুষের ভিড়। সরু পথ। দু'ধারে ভিখারি। কিছু পাবে সেই আশায় সকাল থেকে বসে আছে। সব তীর্থ ক্ষেত্রেই এই এক দৃশ্য। ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে চলি। একসময় পথ এসে শেষ হয়। বাজার পেরিয়ে আসি। পরপর কয়েকটা ছোটো মন্দির। একটু এগিয়েই থমকে যাই। সামনে ঘাট শুরু হয়েছে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। সিঁড়ির ধারে ছোটো ছোটো মন্দির। সিঁড়ি শেষ করে চওড়া চাতাল। সেই বিখ্যাত ছাতা।